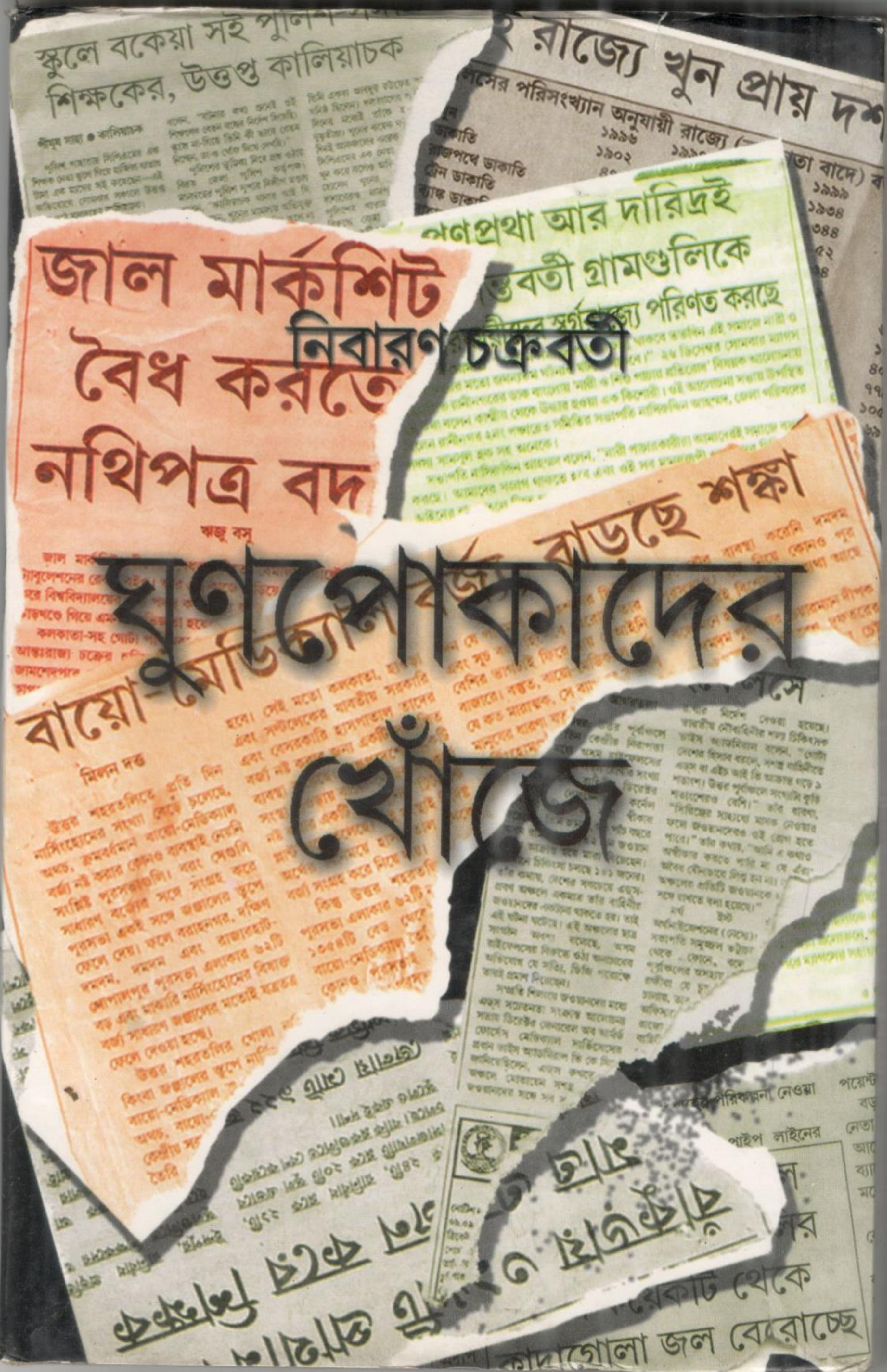
নিবারণ চক্রবর্তী

ঘুণপোকাদের খোঁজে



ঘুণপোকাদের খোঁজে

নিবারণ চক্রবর্তী

প্রলেখা
৯/৩ টেমার লেন কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

প্রকাশক : গুণেন শীল পত্রলেখা ৯/৩ টেমার লেন কলকাতা-৯

মুদ্রক : সিদ্ধেশ্বরী প্রিন্টিং অ্যান্ড ওয়ার্কস ৬৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ: রাজেন্দ্র আশ

দাম : ৫০.০০

কৈফিয়ত

এই বইটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখা তা হল অনালোচিত, অনালোকিত মারণ-জীবাণুদের কার্যকলাপ গুলিকে প্রাপ্ত-মনস্ক পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। লিখিত বিষয়গুলির কোনোটিরই বিশেষজ্ঞ নন লেখক সেজন্য বিশেষজ্ঞের চোখে নয় একজন সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে আজকের ঘুণপোকাগুলোকে চিনতে চাইলে মনে হয় পাঠক ঠকবেন না। যদি কয়েকজন মানুষেরও চিন্তা-ভাবনাকে লেখাগুলি কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে, তাহলেই লেখক তার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবেন।

১১ নভেম্বর, ২০০৫

ধন্যবাদান্তে, নিবারণ চক্রবর্তী

ভূমিকা

"দেড় খানা রুটি নিয়ে বিবাদ, স্ত্রীর
লাঠিতে স্বামীর মৃত্যু বেলডাঙায়।"

"নিজে না খেয়ে দু-বছরের মেয়ে নাজিরার জন্য খানকয়েক রুটি সরিয়ে রেখেছিলেন হাসিনা। কিন্তু খিদের তাড়নায় স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সেই রুটিতেও চুপিসারে ভাগ বসিয়েছিলেন নাজিরার বাবা ইমাম হোসেন। ঘরে এসে থালা সরাতেই হাসিনার চোখে ধরা পড়ে ইমামের এই 'অপরাধ'। শুরু হয়ে যায় স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। তারই জেরে ক্ষিপ্ত হাসিনা ঘরের কোনো থেকে লাঠি তুলে ইমামের মাথায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। বেকায়দায় আঘাত লাগায় ঘরের মেঝেতেই লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রতিবেশীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যান ইমাম (২২)। ঘটনার পরেই ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গিয়েছেন হাসিনা।

ইমাম হোসেনের পরিবার বেশ কয়েকদিন ধরেই অভুক্ত ছিল বলে গ্রামবাসীরা জানান। বুধবার সকালে ইমামের বাবা নাসের শেখ বাধ্য হয়েই স্থানীয় এক সুদ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে স্থানীয় এক মুদির দোকান থেকে কিছুটা গম কিনে এনেছিলেন। সেই ভাঙানো গমের আটা থেকে প্রায় সাড়ে তিনদিন পরে ওই পরিবারে গোটা কয়েক রুটি হয়েছিল। নিজের ভাগের তিনটি রুটি খাওয়ার পরেও হয়নি ইমামের। তাই, স্ত্রী ও মেয়ের জন্য তুলে রাখা বাকি চারটি রুটির দেড়খানা খেয়ে নিয়েছিলেন ইমাম। আর তারই পরিণতিতে ওই মর্মান্তিক ঘটনা। জেলা পুলিশ জানায়, অভাবের সংসারে রুটি ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদের জেরে খুন হন ওই যুবক।"

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৫-৭-২০০৫

সূচিপত্র

মগজ-ধোলাই

ঘটনা-১ ঃ — সিধেসাধা ভালোমানুষ ধরনের পড়ুয়া ছেলে দীপঙ্কর। ছেলেবেলা থেকেই ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত। বাবা-মায়ের গর্ব আর প্রতিবেশীদের দীর্ঘশ্বাসের কারণ হয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার পর আই.আই.টিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য হওয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো র‍্যাংক করল। বছর তিনেক পরে সবাইকে অবাক করে দিয়ে খবর পাওয়া গেল যে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রকে র‍্যাগিং করার সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় ছাত্রটি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এজন্য শেষ-মেষ আরও দুজন চতুর্থবর্ষের ছাত্রের সঙ্গে দীপঙ্করকেও পুলিশ ধরেছে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে কলেজ থেকে বহিষ্কারও করেছে।

ঘটনা-২ ঃ— কারও সাতে-পাঁচে না থাকা লোক গণেশ। নদী-জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবন অঞ্চলে বাড়ি-জমির সীমানা নিয়ে শরিকি বিবাদের মীমাংসার জন্য এক রাজনৈতিক দলের স্থানীয় মাতব্বরের সাহায্য পাওয়ার আশায় গিয়েছিল সে। এরপর বছর দুয়েকের মধ্যে গণেশ ওই দলের অন্ধ, উগ্র সমর্থক হিসাবে পড়শির আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এরও বছর খানেক পরে এক নির্বাচনের দিন পনেরো আগে এলাকা দখল রাখার লড়াই লড়তে গিয়ে এক রাতে গণেশ 'শহিদ' হল। মৃতদেহ পাওয়া গেল তাঁর নিজের গ্রাম থেকে সাতচল্লিশ কিলোমিটার দূরে।

ঘটনা-৩ ঃ— শিক্ষিত বেকার যুবক তরুণ। প্রাথমিক স্কুলের আদর্শবাদী হেডমাস্টার বাবা অবসর নেওয়ার পর কোনো টাকা-পয়সা পাননি। শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা ও মানসিক যন্ত্রণার উপশমের কোনো উপায় না দেখে একদিন রেলে মাথা দিলেন। বনগাঁর ছেলে তরুণ বিধবা মা, ভাই আর বোনের মুখে দু'মুঠো ভাতের জোগান দেওয়ার জন্য যে কোন কাজ করতে রাজি। এলাকার এক বিখ্যাত 'সমাজসেবী'র চেষ্টায় কাজও পেল সে। কিছুদিন পর থেকে ভালোই রোজগার করা শুরু করল। সীমান্তের ড্রাগ-পাচারের এক চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল সে। যথারীতি এজন্য মাঝেমধ্যেই অন্য চক্রগুলির সঙ্গে লড়াইও করতে হয়। এইরকম এক লড়াইয়ের বলি হয়ে গেল একদা লাজুক, একদা হিংস্র সাধারণ বাড়ির সাধারণ ছেলে তরুণ।

উপরের তিনটি ঘটনাই কাল্পনিক , কিংবা হয়তো নাম-ধাম বাদে বাকি সবই বাস্তব। এই ঘটনাগুলি একে-অন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন হলেও এদের মধ্যে একটি মিলও আছে এগুলি সবই আলাদা আলাদা পরিবেশে আলাদা-আলাদা রকমের মগজ-ধোলাই - এর ফসল। কোথায় যেন পড়েছিলাম কোনো মিথ্যা কথা কাউকে বার বার বিশ্বাসযোগ্য করে শোনাতে পারলে একসময় সেই ব্যক্তির মনে কথাটি পরম সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে শুধু কিছু কথা

শুনিয়েই কোনো মানুষের মনের মধ্যে একটা মিথ্যাকে চিরন্তন সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে দেওয়া সহজ নয়। সেজন্য আজকাল যারা এই উদ্দেশ্যে কাজ-কারবার করেন, তারা এরজন্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চারিপাশের পরিবেশটিকেও আগেভাগে এই কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। পুরো ব্যাপারটির জন্য একটি সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানসম্মত চক্রান্ত করতে হয়। সুপুরি ফাটানোর জন্য চারিপাশের চাপ আর হাতুড়ির আঘাত একসঙ্গে এমনভাবে পড়ে, যাতে সুপুরির না ফেটে অন্য কিছু হওয়ার কোনো উপায় থাকে না। এই সুপুরিটি হল একজন মানুষের স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি, স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা। এগুলি ধ্বংস করে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কোনো মানুষের মনে একটি মিথ্যাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পুরো পদ্ধতিটিকে বলা যেতে পারে Brain Wash বা মগজ-ধোলাই।

মগজ-ধোলাই নানান ধরনের, নানান ফিকিরের হতে পারে। একবার ধোলাই সম্পূর্ণ করতে পারলে একটি মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, ধাত—সবই চিরতরে বদলে দেওয়া যায়। মগজ-ধোলাই ব্যাপারটিকে এক ধরনের স্থায়ী সম্মোহনও বলা যেতে পারে।

আমাদের অজান্তেই আমাদের প্রায় সবারই কমবেশি মগজ ধোলাই হয়ে চলেছে প্রতিদিন। যেমন ধরুন প্রতিদিনকার খবরের কাগজ খুললেই যা আমাদের চোখে পড়ে, তা আসলে আমাদের চোখে পড়ানো হয়। টেলিভিশন-রেডিয়ো-খবরেরকাগজ—এসব মিডিয়াতে যা দেখানো জানানো হয়, আমরা আসলে তাই দেখি-জানি (তাই যা দেখানো, জানানো হয় না, তা জানি না!)। তবু গণতান্ত্রিক দেশ হওয়ার কারণে (অনেক সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও) বিভিন্ন মিডিয়া একসঙ্গে মাথায় ঢোকার কারণে আমাদের মধ্যে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা গড়ে ওঠার একটা সম্ভাবনা থাকেই, অন্তত কিছু মানুষের মধ্যে। তা ছাড়া কিছু মানুষ তো থাকেনই, যারা কিছু বিশ্বাস করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করেন বার বার, আর নিজের বিবেকের সাড়া পেলে তবেই কোনো কিছু বিশ্বাস করেন। অধিকাংশ মানুষই এরকম যুক্তিবাদী নন, তবে নিজেকে বা অন্যকে প্রশ্ন করার অভ্যেস থাকলে কেউ কেউ কোনো একদিন নিজের বিশ্বাসকেও প্রশ্ন করে ফেলতে পারেন। এই ব্যাপারটিই কিন্তু আবার একদল মানুষের কাছে বিপদের সংকেত, আতঙ্কের কারণ। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের স্বাধীন চিন্তা করতে পারা মানুষ খুব বেশি না তৈরি হতে পারে, তার জন্য চারা অবস্থাতেই ঝাউগাছের ডালগুলিকে প্রয়োজনমতো কেটে রাখতে হয়। মানুষের এই চারাগাছ অবস্থাটি হল Teen age— অর্থাৎ তেরো থেকে উনিশ (Thirteen to Nineteen) বছর বয়স। এই বয়সের মধ্যেই মাথার মধ্যে ড্রিল করে ফুটো তৈরি করে কিছু ভুল বিশ্বাসের কারবাইড ঢোকাতে পারলে এঁচোড়পক্ক মস্তিষ্কগুলি ভবিষ্যতে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যাবে সহজেই। এই বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর এসব কিছু করতে গেলে অনেক বেশি জোগাড়-যন্তর করতে হয়। সেজন্য পনেরো-কুড়ি বছরের উদ্দাম রক্তের ছাত্রদের মাথায় একবার Brain Wash করে জলাতঙ্কের জীবাণুর মতো বিষাক্ত কিছু ধারণাকে ঢুকিয়ে দিতে পারলে তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালে এদের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা জন্মাতে পারে না, আর তখন যেমনটি

করে যে বিষয়টি বুঝতে শেখানো হয়, তেমনটি করেই এরা সেই বিষয়টি বুঝতে পারে, অন্য কথা বুঝতে চায় না বা পারে না। ছাত্র-যুবাদের মস্তিষ্ক ধোলাই-এর উপকরণ হিসাবে সেইজন্যই বাজারে সহজলভ্য করে রাখা হয় যৌন উত্তেজক বই, পত্র-পত্রিকা, নীলছবির সি.ডি. আর নানান নেশাদ্রব্য। এছাড়াও বন্দোবস্ত রাখা হয় সরকারি-বেসরকারি হরেক কিসিমের জুয়ার। টীকা না দেওয়া জলাতঙ্ক রোগীর মতো অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে এরাও নিজেদের মুর্খামির দাম দিতে বাধ্য হয়ই, তবে তার আগে এদের কামড়ে জলাতঙ্ক (পড়ুন জ্ঞানাতঙ্ক) রোগ আরও অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যেই বোধহয় আমাদের কলেজগুলিতে পড়াশোনার কোনো বালাই রাখা হয়নি। ভবিষ্যতের একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা তৈরি করার ফ্যাক্টরি হিসাবেই এগুলি ব্যবহৃত হয়। পার্টির দাদাদের ইঙ্গিতে দলবদ্ধভাবে গুন্ডামি-মস্তানি করা শেখা, স্টুডেন্ট ইউনিয়ন দখলে রাখার জন্য কলেজ ইউনিয়নের ভোটে বিভিন্ন ধরনের রিগিং-এ হাত পাকানো, অন্য দলের ছেলেদের পেটানো, বোমা বাঁধা শেখা, বোমা ফেলতে শেখা, বন্দুক-পিস্তল চালাতে শেখা ইত্যাদি নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ধাপে ধাপে শেখার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় ছাত্রদের, তাই পড়াশোনা করার সময় কোথায় ? এ সমস্ত ব্যাপারগুলি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার মতো সময়ও কারোর নেই, আর রাজার পরনে পোশাক আছে কিনা দেখার জন্য কোনো বুদ্ধিজীবীও নেই। যে যার নিজের প্রয়োজনে নিজেদের মতো করে ছাত্রদের ব্যবহার করে চলেছে। এই প্রজন্মের ধোলাই হওয়া মস্তিষ্কের ছাত্ররাও এইভাবে ছাত্রজীবন কাটানোটাকেই সম্ভবত সঠিক বলে মনে করেন। অথচ আজও গরিব বা মধ্যবিত্ত বাড়ির যে দু-একটি বাঙালি ছাত্র রাজ্যের বাইরে এবং দেশের বাইরে গিয়ে সুযোগ পেয়েছে সঠিকভাবে শিক্ষালাভ করার আর বড়ো হওয়ার - তারা জাতিগতভাবে বাঙালিদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অন্যদের থেকে কতটা বেশি— তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পেরেছে, আর অন্যেরা বালির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে থাকাটাকেই একমাত্র ভবিতব্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে।

আমাদের দেশের তরুণদের চোখে আর কোনো 'স্বপ্ন' নেই। কোনো আদর্শের প্রতি স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি রেখে, একটি লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যাওয়া নয়, কিছু কুশলী কূচক্রীর হাতে ব্যবহৃত হওয়াই যেন আমাদের দেশের যুব-সমাজের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে এই দেশে, এই যুগে তরুণ সমাজ চোখের সামনে, মনের মধ্যে অনুকরণযোগ্য কোনো আদর্শের হদিশ পাচ্ছে না। বিশ্বাস করার বা আস্থা রাখার কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না। বিশ্বাসহীনতার এই যুগই বোধহয় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে তরুণদের মনে এই রকম হাজারও মিথ্যে আশা, মিথ্যে 'আদর্শের' স্বপ্ন তৈরি করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে তাদের তারুণ্যকে ব্যবহার করার। এই পথ হারানোর যুগে, দিশাহীন অন্ধকারের মধ্যে কিছু উচ্চবিত্ত পরিবারের তরুণ-তরুণী 'ক্যারিয়ার' তৈরি করে ভোগ্যপণ্য অর্জন করাটাকেই ভাবছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর বাকিদের সামনে শুধুই অন্ধকার ভবিষ্যৎ। 'দেশ সেবক' সমাজ বিরোধীদের হাতের কাছে এত সহজলভ্য বারুদ থাকলে বোমা বানানো তো খুবই সহজ!

এ তো গেল 'শিক্ষিত' মানুষজনদের ব্যাপার। অশিক্ষিত, গরিব মানুষদের মস্তিষ্কগুলিকে ধোলাই করা তুলনায় অনেক সহজ। কোনো একটা আপাতভাবে লোভনীয় বিষয় সামনে ঝুলিয়ে (এবং অবশ্যই আসল উদ্দেশ্যটি আড়ালে রেখে) কিছু ধান্দাবাজ, বুদ্ধিমান মানুষ যখন এই ধরনের অশিক্ষিত মানুষের বন্ধু সেজে নিজের বা নিজেদের স্বার্থে এক ব্যাপক সংখ্যার মানুষের মস্তিষ্ক-ধোলাই করে ফেলতে পারেন, তখন বেশ একটা "আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ" করার মতো মানসিকতা নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া পাখাও'লা পিঁপড়ের মতো এনারা দলে দলে এগিয়ে আসেন ধান্দাবাজদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে। এই স্বার্থ কখনও হয় একদল মানুষের ধনলোভ বা পদলোভ, কখনও বা হয় একটা জাতির বা দেশের মধ্যে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়ে দেশটিকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি।

মোগজ ধোলাইয়ের অনেক ধরন আর রকমফের আছে। যেমন ধরা যাক, মুরশিদাবাদ জেলার কথা। এই জেলা খুনোখুনিতে সারা বছর সংবাদপত্রের শিরোনামে থাকে, অথচ এখানে সবজি উৎপাদন হয় খুব ভালো। কিন্তু ক্রেতা নেই। অথচ এই সব সবজি সংরক্ষণ করার বা কলকাতার বাজারে নিয়ে যাওয়ার কোনো ভালো ব্যবস্থাও নেই। সেজন্য যখন কান্দী, ইসলামপুর বা বহরমপুরের বাজারে জোড়া এক টাকা দরে ফুলকপি, বাঁধাকপি বা দুই টাকা কিলো দরে শিম, শশা, ওলকপি বিক্রি হয়, তিন টাকা ডজনে সিঙ্গাপুরি কলা বিক্রি হয়, তা খবর হয় না। তাও এই টাকাটা মধ্য ব্যবসায়ী বা দালালরা পায়, চাষি কী পায় তা সহজবোধ্য। শহুরে 'বুদ্ধিজীবীগণ বা মিডিয়া এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না-কারণ বিষয়গুলি 'পাবলিকের ভালো খাদ্য' নয় - তাই তার একটা না হয় মানে পাওয়া গেল— কিন্তু আধপেটা খাওয়া চাষিদের মুখে প্রতিবাদের ভাষাটুকু পর্যন্ত নেই- এর কারণ কী? এই ব্যাপারে একটাই বিশ্লেষণ সম্ভব - তা হল রাজনৈতিক দাদাদের প্রতিবাদ- প্রতিবাদ খেলা দিয়ে মানুষ ভোলানোর খেলায় মস্তিষ্ক ধোলাই হয়ে গিয়ে সত্যিকারের প্রতিবাদটুকু করতেও গরিব, নির্যাতিত মানুষরা ভুলে গেছে।

সামাজিক মানুষ হিসাবে আমরা, যারা এই দেশ, এই পৃথিবী আলো করে আছি বলে মনে করি, আমাদের সকলের মধ্যেই জন্মানোর পর থেকে শেখা অনেক ভুল ও মিথ্যেই কিন্তু মনের মধ্যে স্থায়ী সংস্কার হিসাবে বাসা করে আছে। একজন মুক্ত মনের মানুষ, মুক্ত চিন্তার মানুষই কেবলমাত্র পারেন তার নিজের মধ্যে থাকা ভুল ধারণা, অযৌক্তিক সংস্কারগুলোকে বুঝতে। সেই সংস্কার ও ধারণাগুলোকে এরপর ত্যাগ করা, অন্যদেরও এইসব ভুলগুলোকে শোধরাতে সাহায্য করা —এসব অনেক পরের কথা। একথা দুঃখের হলেও সত্যি- আমাদের অধিকাংশই এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। অন্যদিকে - যে পারিপার্শ্বিক, যে সমাজে এই ধরনের মুক্তচিন্তা প্রবেশ করার পথ কম, সেই সমাজে বসবাসকারীদের মধ্যে স্বচ্ছচিন্তার মানুষের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে কম। আবার এই রকম সমাজের, বা অন্যভাবে বললে এইরকম অবস্থায় বড়ো হওয়া মানুষজনের মস্তিষ্ক ধোলাই করা খুবই সহজ। যে দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ লিখতে পড়তে জানে না, সেখানে মগজ-ধোলাই ব্যাবসা তো দারুণ লাভজনক হবেই! গরিব, অশিক্ষিত মানুষ কাউকেই প্রশ্ন করতে জানে না—

নিজেকে প্রশ্ন করতে শিখবে কীভাবে? যে কোনো ভুল ধারণা, মিথ্যে কথাকে সত্যি হিসাবে বিশ্বাস করা এই ধরনের মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সেজন্য যেসব চক্রান্তকারী মানুষ চায় অধিকাংশ মানুষকে বোকা বানিয়ে রেখে স্বার্থসিদ্ধি করতে, তারা কখনই শিক্ষার সত্যিকারের প্রসার চায় না। মানুষের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হলে স্বভাবতই তার পক্ষে 'শিক্ষিত' হওয়া কষ্টকর— সেজন্য এসব চক্রান্তকারীরা চায় না গরিব মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি। এছাড়া গরিব মানুষের পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বাড়ে, ততই বাড়ে তার অভাব। সেজন্য শিক্ষা-দীক্ষা বা আর্থিক উন্নতির রাস্তা থেকে এইসব মানুষ ক্রমশ পিছিয়ে গিয়ে শুধুমাত্র মস্তিষ্কহীন ভোটারের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। ঠিক এই ব্যাপারটিই আমাদের দেশের রাজনীতি ব্যবসায়ীদের কাছে পরম কাম্য বোমা বানাতে গিয়ে যারা মারা পড়ে, তারা সবসময়ই হয় সমাজের একদম নীচুতলার মানুষ, যাদের কাছে 'পেট' একটা বিরাট ব্যাপার। শিক্ষিত ধান্দাবাজরা এদের শুধু ব্যবহারই করে। কিন্তু এসব কথা সাধারণ মানুষ জানতে-বুঝতে পারলে উদ্দেশ্য কীভাবে সফল হবে! সেজন্য সমাজবিরোধীদের প্রয়োজন হয় 'সমাজসেবক' মুখোশের। মুখোশধারীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলো মিথ্যে কথাকে কখনও ধর্মের মোড়কে, কখনও 'ইজমে'র মোড়কে মানুষকে কায়দা করে গেলান। সুবোধ-বালক গোপালেরা এরপর ধুরন্ধরদের চটিজুতোর মতো ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে ধর্মের নামে, রাজনৈতিক মতাদর্শের নামে মানুষকে উন্মত্ত করে দিয়ে, একদলকে আরেক দলের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে কাদের কী লাভ হয় তা, আমরা, 'শিক্ষিত-সচেতন' মানুষরাই বা কজন বুঝতে পারি? সেই অর্থে গোপাল তো আমরা প্রায় সবাই।

একবার কোনো মানুষের মস্তিষ্ক ঠিকমতো ধোলাই হয়ে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বোধগুলি হারিয়ে যায়। তোতাপাখির মতো শিখিয়ে দেওয়া বুলি ছাড়া তার মাথায় আর কিছু থাকে না। শুধুমাত্র অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষ নয়, অনেক তথাকথিত 'শিক্ষিত', 'বুদ্ধিজীবী' মানুষ, যাদের কেউ কেউ আমাদের সামাজিক হিসাবে নিজেদের ক্ষেত্রে সফল বলেও গণ্য হন, তারাও অনেকে এই দলে পড়েন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাওয়া শিক্ষা কিন্তু তাদেরও মস্তিষ্কের ঘন অন্ধকার ভেদ করে যুক্তিবোধের ছিটেফোঁটা আলোও ঢোকাতে পারে না। মস্তিষ্ক ধোলাই এতটাই ক্ষমতাশালী।

—

বঙ্গীয় শিক্ষা ব্যবস্থা : ঘুণপোকাদের খোঁজে

গাছ না দেখে ফলের বিচার করে কি লাভ?

এক : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা—কে, কারে, কী দেয় ?

আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে অনেক 'বিদগ্ধ' ব্যক্তি সরকারিপৃষ্ঠপোষকতায় অনুসন্ধান করে কয়েক বছর অন্তর অন্তর তাদের জ্ঞানগর্ভ রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। এইসব রিপোর্টের উপর নির্ভর করে কখনও প্রাথমিকস্তরে থেকে 'বিদেশি' ইংরাজি ভাষা শিক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে, কখনও বা রিপোর্ট অনুযায়ী তা ফিরিয়ে আনাও হয়েছে। মাঝেমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য স্বদেশি-বিদেশি নানা ঋণ বা অনুদানের কোটি কোটি টাকা খরচ করে নানান ধরনের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এখন আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং নেওয়া না থাকলে কাউকে আর প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হবে না। এই হিসাব মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের শ-দুয়েক প্রোমোটার আর কালো টাকার মালিক ব্যাবসাদারকে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র খুলে কোটি কোটি টাকা লুঠ করার এক মহা-লাভজনক ব্যাবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এগুলিতে কে পড়ায়, কী পড়ায়, কাকে পড়ায়— সব কিছুই অস্পষ্ট। এসব স্বত্ত্বেও অবস্থা প্রতিদিন আরও খারাপ হয়েই চলেছে। আসুন, বিশেষজ্ঞের চোখে নয়, একজন সাধারণ মানুষের চোখে পচনের কারণগুলো বোঝার চেষ্টা করি।

প্রাথমিকে যারা এখন শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত আছেন— তাদের একটা বড়ো অংশেরই শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদান সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, অনেকের আবার এ ব্যাপারে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার বিষয়টিও সন্দেহজনক। মাঝবয়সি কিছু ব্যক্তিকে শিক্ষকতার 'চাকুরি' দেওয়ার পর হরেক কিসিমের 'ট্রেনিং' দেওয়া মানে সরকারি অর্থের অপচয় করার একটি রাস্তা তৈরি করা, আর এইসব শিক্ষকদের হলঘরে ফ্যানের তলায়-বসিয়ে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করা। যে ট্রেনিং দেওয়ার পর কোনো পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না—সে ট্রেনিংয়ের কোনো গুরুত্ব আছে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। তা ছাড়া ট্রেনিং নেওয়া ব্যক্তিরা কেমন? অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাদান সম্পর্কিত কোনো যোগ্যতার পরীক্ষা না করে অন্যান্য নানান 'যোগ্যতা' দেখিয়ে আইনের নানান ফাঁক গলিয়ে এসব ব্যক্তিকে চাকুরি দেওয়া হয়েছে— যথা সরকারি জনগণনার কাজ করা, সরকারি কোনো প্রকল্পে সাময়িকভাবে কাজ করা ইত্যাদি। দীর্ঘদিন ধরে 'রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজসেবা' করে যাওয়াটাই এদের যোগ্যতা নিরূপণের আসল মাপকাঠি, সেই মাপকাঠির হিসাব করে কিছু ব্যক্তিকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে 'শিক্ষকতার চাকুরি' । স্বভাবতই আসল 'নিয়োগকর্তার' কাছে দায়বদ্ধ থাকা এসব শিক্ষকের বাচ্চাদের পড়ানোর দিকে কতটা সদিচ্ছা বা মনযোগ থাকা সম্ভব - তা সহজেই

অনুমেয়। এসব 'শিক্ষক'দের একাংশ আবার অন্যান্য নানান অর্থকরী ব্যাবসা বা জীবিকার সঙ্গেও যুক্ত থাকেন—সেজন্য অনেকেই স্কুলের প্রয়োজনীয় 'খাতা সারা' আর পড়ানোর জন্য মাসিক পাঁচ -ছশ টাকা 'বেতনে' কিছু বেকার ছেলেকে 'নিয়োগ' করেন। এদিকে আবার প্রাথমিক শিক্ষকদের বছর ভর নানান সরকারি কাজে সময় দিতে হয়—যেমন - মানুষ গণনার সেনসাস্, অর্থনৈতিক সেনসাস্, স্যানিটেশন সেনসাস্, পোলিও টীকাকরণের প্রচার, সর্বশিক্ষা অভিযানের কাজ, ভোটার লিস্ট তৈরি করা, ভোটার লিস্টে নাম তোলা ও নাম বাদ দেওয়া, পঞ্চায়েত, বিধানসভা বা লোকসভার ভোটে ডিউটি করা ইত্যাদি। এখন তো আবার তিন চার কামরার প্রাইমারি স্কুলগুলিতেও চালডালের ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, জ্বালানি ঘর-এসবের জন্যও জায়গা ঠিক করতে হচ্ছে, আর এই বস্তুগুলির নিয়মিত সরবরাহ রাখার বন্দোবস্ত করে রেখে ছাত্রদের জন্য নিয়মিত দ্বিপ্রাহরিক খিচুড়ি তৈরির ব্যবস্থা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটিও আবার 'মিড ডে মিলের দুর্নীতি' হিসাবে প্রায়ই খবরের কাগজের শিরোনাম অধিকার করছে। গ্রামাঞ্চলের ছাত্ররাও পড়াশোনা করার চেয়ে রান্না কতদূর এগোল সেই খবর নেওয়াতেই বেশি আগ্রহী। কাজেই এতসব কাজকর্মের ভিড়ে শিক্ষকদের পড়ানোর আর শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করার মানসিকতা ও সময় কতটা মেলে - তা বলা মুশকিল।

আমাদের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে এখনও কিছু শিক্ষক আছেন, যাঁরা সত্যি সত্যিই ছাত্রদের কিছু শেখাতে চান। কিন্তু এইসব বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির শিক্ষকরাই বা কতটা কী করতে পারেন? অনেক প্রাথমিক স্কুলে স্থায়ী স্কুলঘরই নেই, ছাত্রদের বসার বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড, গ্লোব ম্যাপ বা অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জাম- এসব তো অনেক পরের কথা। সরকারি হিসাবেই এক শিক্ষক বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এ রাজ্যে প্রায় চারহাজার, গৃহহীন 'বিদ্যালয়ের' সংখ্যা কয়েকশো। মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে প্রতি ৮০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক অন্তত থাকবেন - এমন সরকারি নিয়ম আছে। সেই নিয়ম মেনেও যে প্রতিটি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, তা নয়। একজন শিক্ষকের কথা মাইকের ব্যবহার ছাড়াই কীভাবে একটি ক্লাসের আশিজন ছাত্রের কাছে পৌঁছবে, তার হিসাব শিক্ষাদপ্তরই জানে। বাস্তবে মফস্সলের এমন অনেক স্কুল আছে, যেখানে নীচের দিকের ক্লাসগুলিতে এক একটি সেকশনেই ২০০ বা তারও বেশি ছাত্র 'পড়ে'। সব ছাত্রের বসারই ব্যবস্থা নেই — অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একটি ঘরের মধ্যে এত ছাত্রকে কি সত্যি সত্যিই সুশিক্ষা দেওয়া সম্ভব? Democratisation of education করতে গিয়ে Idiot production through education হয়ে যাচ্ছে — তা বোঝার বা বলার মতো মানুষও এখন মিলছে না।

চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের সমর্থক পরিবারের কিছু গ্রাম্য মহিলাকে মাসিক হাজার টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমান্তরালভাবে যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি আমাদের রাজ্যে চালু করা হয়েছে—সেগুলির অবস্থা আরও করুণ। অধিকাংশ স্কুল চালানো হয় কোনো ক্লাব ঘরে, হরি মন্দিরে, কারও বাড়ির বারান্দায় এমনকি গোয়ালেও! মোট ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে দেখিয়ে বেশি সংখ্যক 'শিক্ষক' নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে সর্বত্রই ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো

হয়— প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠরত: ছাত্রদের নামও অনেক সময় এই কেন্দ্রগুলির খাতাতে থাকে। আর শিক্ষার মান? কোনো একটি ব্লকে সহায়িকাদের গুণমান যাচাই করার জন্য একটি লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল— যেখানকার প্রশ্নের মান ছিল চতুর্থ শ্রেণির। শতকরা মাত্র দু-জন পাস করেছিলেন এই পরীক্ষায়! * এখন আবার পার্শ্ব-শিক্ষক (প্যারা টিচার) নামে প্রাথমিক - মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ করা শুরু হয়েছে - মাসিক বেতন প্রাথমিকের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা , মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা। বেকার ভরা এ দেশে বোধহয় যে-কোনো মূল্যে মানুষের মেধা ও শ্রম কেনা যায়, না হলে একজন অক্ষর জ্ঞানহীন অদক্ষ শ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি যেখানে ৬২ টাকা, সেখানে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দৈনিক ৩৩ টাকা!

রাজ্য সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের গরিব বাড়ির শিশুদের জন্য আই.সি.ডি.এস. পরিচালিত কিছু শিশু বিকাশ কেন্দ্রও এ রাজ্যে চালু আছে। এই কেন্দ্রগুলিতে মাসিক বারোশো টাকা বেতনের শিক্ষক-কাম-রাঁধুনি-কাম স্বাস্থ্যকর্মী-কাম-পরিসংখ্যানবিদ এবং সাতশত টাকা বেতনের সহকারী রাখা আছে। গ্রামের অপুষ্ট শিশুদের পুষ্টির জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ৩৫ গ্রাম চাল, ১৭গ্রাম ডাল আর আশি জন বা তার বেশি সংখ্যার ছাত্রের তেল, লবণ, মশলা, জ্বালানি খরচ বাবদ নয় টাকা বরাদ্দ । সুতরাং বাচ্চাদের পেটে কি পৌঁছে তা সহজবোধ্য। এত পুষ্টি খেয়ে বাচ্চারা হৃষ্টপুষ্ট হবে না মানে ?

পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি অবধি চলা জুনিয়র হাইস্কুল বা পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি অবধি চলা হাইস্কুল, অথবা দ্বাদশ শ্রেণি অবধি পড়াশোনা শেখানোর ব্যবস্থা থাকা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল — এ স্কুলগুলি সবই স্কুলশিক্ষা দপ্তরের আওতায় পড়ে। এগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মকানুন সবই সংশ্লিষ্ট দপ্তর তৈরি করেন। শুধু আজকের দিনে নয়, গত কয়েক দশক ধরে যাঁরা এই স্কুলগুলিতে শিক্ষকতা করার দায়িত্ব পেয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই মনে করেন যে তাঁরা 'শিক্ষক' নন, শিক্ষকতার নামে একটি চাকুরি করেন মাত্র। আগেকার দিনে সংগঠক শিক্ষকদের প্রজন্ম শেষ হয়ে গেছে — এখন শিক্ষকরা আর কেউ স্কুলের আশেপাশে থাকেন না — প্রায় সবাই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে শিক্ষকতা করতে 'অফিস' আসেন। সরকারি ব্যবস্থাপনা এমন রাখা হয়েছে যে-কোনোভাবেই যেন শিক্ষকরা বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে আসতে না পারেন। একই বিষয়ের দুজন শিক্ষকও চাইলে স্কুল বদলাবদলি করতে পারেন না — হাজারও বিধি নিষেধ সে পথে। আসলে এসব সমস্যার সহজে সমাধান হয়ে গেলে শিক্ষার উন্নতি হতে পারে, কিন্তু শিক্ষকদের সমস্যার মধ্যে রেখে রাজনীতির বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করে যাদের দিন চলে— সেই রাজনীতি ব্যবসায়ীরা বেকার হয়ে পড়বেন যে! সেজন্য কেরানিগিরি বা পুলিশের চাকুরি বা এরকম যে কোনো একটি পেশায় 'চাকুরি' পাওয়া আর শিক্ষকতা করার দায়িত্ব পাওয়া- দুইই শিক্ষকদের কাছে সমার্থক হয়ে গেছে। সেজন্য নিজের চেয়ারকে ব্যবহার করে নানান ফিকিরে অর্থ উপার্জন করা বা স্কুলের সীমানার বাইরের জীবনে কোনো দৃষ্টিকটু বা অশ্লীল ব্যাপার-স্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ নীতিগত বাধার অস্তিত্ব এনারা তাই মনের মধ্যে অনুভব করেন না। সরকারি যে

ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে শিক্ষক নির্বাচন হয়, সেই ব্যবস্থাপনার মধ্যেই এর কারণগুলি লুকিয়ে আছে। অধিকাংশ মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে এক অতি দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষক নিয়োগ করা হত পদপ্রার্থীর আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, শিক্ষাগত যোগ্যতার সেখানে বিশেষ কোনো গুরুত্ব ছিল না। প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক নির্বাচন, শেষে পদের নিলাম ডেকে অর্থনৈতিক নির্বাচন-আর এই দুইয়ের মাঝে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হত খুব গোপনে। কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি আসনের জন্য কুড়িজন করে পদপ্রার্থীর নাম ঠিক করা থেকেই কাজকর্ম শুরু হয়ে যেত। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ 'প্রার্থীকে' পরবর্তীকালে যাতে প্যানেলে প্রথম করানো যায় - তার জন্য অনেক হিসেব-নিকেশ করে এই কুড়িজনের নাম ঠিক করা হতো। এরমধ্যে যে দু-চারজন প্রার্থীর নাম নিয়ম বাঁচানোর জন্য এই লিস্টে নেওয়া হতো - যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশ ভালো — তাদের ইন্টারভিউ-এর চিঠিগুলি অন্য চিঠিগুলির সঙ্গে একসঙ্গে আধিকারিকের সই হয়ে যাওয়ার পর পুড়িয়ে ফেলা হত। অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সহায়তায় খাতায় কলমে তাদের নামে চিঠি 'পাঠানো' হয়ে যেত, আর সরকারি অফিসের কয়েকটি ডাকটিকিট ছিঁড়ে ফেলে ডাকটিকিট খরচ খাতায় তা 'খরচ' বলে দেখানো হোত। সেজন্য প্রায়শই ২০ জনের জায়গায় ৮-৯ জন স্কুলে ইন্টারভিউয়ের দিন হাজির থাকত। আমার জানা এক তপশিলী জাতিভুক্ত গ্রামবাসী অনার্স গ্রাজুয়েট মেয়ে বেশ কিছুদিন বাদে একদিন কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে গিয়ে জানতে পেরেছিল যে তার নামে নাকি ২১টি কল-লেটার পাঠানো হয়ে গিয়েছে!

কিছু নাছোড়াবান্দা পদপ্রার্থী এমন নিয়মিত কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে খোঁজ-খবর রাখতেন, যে তাদের নাম হিসাবমতো না পাঠিয়ে উপায় ছিল না। সেক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের দিন অন্য অনেকরকম বন্দোবস্ত থাকত। সেই সময়কার নিয়ম অনুসারে Academic Record এ নাম্বার হিসাব করার পর যে প্রার্থী প্রথম হতেন, তাকে মৌখিক ইন্টারভিউ ও শিক্ষাদানের পরীক্ষায় ১০ নাম্বারের মধ্যে ১, ১/২, ১/৪ বা অনেক সময় ০ নম্বর দেওয়া হত — যাতে স্কুল কমিটির কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা শিক্ষকতার পোস্টটি নিলামে ওঠার সময় যিনি সর্বোচ্চ দর হেঁকেছেন, তাকে ১০-এর মধ্যে ৯, ৯১/২ বা ১০ নাম্বার দিয়ে প্রথম করা যায় প্যানেলে। এইভাবে হাজারে হাজারে অযোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করে স্কুলগুলি সব ভরিয়ে ফেলা হয়েছে। নিকৃষ্টতম রেজাল্টের ছেলেমেয়েরা পেয়েছে 'মাস্টারের চাকুরি', আর তাদের চেয়ে অনেক ভালো ক্যারিয়ারের ছেলেমেয়েরা কেউ টিউশন করে, কেউ চানাচুরের ব্যাবসা করে দিন কাটাচ্ছে। এসময় যেসব ছেলেমেয়েরা কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে 'শিক্ষকতার চাকুরি' পেয়েছিলেন, তাদের বক্তব্য আবার অন্যরকম। চাকুরিতে ঢোকার প্রথমদিন থেকেই এনারা ক্লাসের ছাত্রদের ফেল করানোর ভয় দেখিয়েই হোক বা কোন কিছুর লোভ দেখিয়েই হোক বা অন্য কোনো অসৎ উপায়েই হোক, বেশ কিছু ছাত্র জোগাড় করে 'প্রাইভেট' পড়ানোর ধান্দা করতেন। প্রথমদিকে এনাদের বক্তব্য ছিল-যে টাকা দিয়ে চাকুরিতে ঢুকেছেন, সুদে আসলে সেই টাকা তোলার প্রয়োজনে এসব করা । এনারা সারাদিনে তিন খেপ প্রাইভেট

পড়ানোর মাঝে স্কুলে যেতেন শুধু বিশ্রাম নিতে। পরবর্তীকালে এনাদের এই অভ্যাস স্থায়ী হয়ে গেল। কয়েক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়ে অন্যায়ভাবে যোগ্যতর প্রার্থীদের হটিয়ে দিয়ে যারা 'শিক্ষক' হয়েছেন তাদের নীতিবোধ কেমন হবে তা অনুমান করতে খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন নাই। এরপর চালু হল স্কুল সার্ভিস কমিশন — সেখানেও যথারীতি নানান রকমের দু-নম্বরির বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। প্রথমদিকে স্কুল সার্ভিস কমিশন তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের Rank-ই জানাত না- জানতে গেলে বলা হতো "আপনার নাম অবধি সিরিয়ালে এলে বাড়িতে নিয়োগপত্র পৌঁছে যাবে, সেজন্য কোনোরকম খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন নাই"। হাজার হাজার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী দিনের পর দিন নিয়োগপত্রের আশায় পোষ্টম্যানের দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় জানল যে তাদের 'প্যানেল' বাতিল হয়ে গেছে। প্যানেলটি কী বা কে, কে সেই 'প্যানেল' থেকে কীভাবে চাকুরি পেল— তা জানার কোনো অধিকারই তাদের নাই। কীভাবে কী করা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এইরকম বঞ্চিত মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রার্থী আদালতে গিয়েছিলেন - আদালত সরকারি 'প্যানেল' দেখতে চাইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তা না দেখিয়ে আদালতের বিচারপ্রার্থীদের চাকুরি দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু আদালতে যাওয়ার সুযোগ, ক্ষমতা বা সামর্থ যাদের ছিল না, সেরকম হাজার হাজার প্রার্থী কোথায় হারিয়ে গেছেন, তার খোঁজ কেউ রাখে না। এখন অবশ্য যা করা হয় তা অনেক আঁট ঘাঁট বেঁধে রেখেই করা হয়— অভিজ্ঞতা বেড়েছে না!

আজকের দিনে সমস্ত রকমের শিক্ষক নির্বাচনের প্রতিটি স্তরেই রাজনৈতিক দাদাদের সক্রিয় সহযোগিতা হল এক অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত প্রকট। অতীতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষার খাতা 'পরীক্ষা' করতে গিয়ে আদালত ফাঁকা খাতায় শতকরা আশি শতাংশ নাম্বার দেওয়া বা এই ধরনের বেশ কিছু অনিয়ম ধরে ফেলে কয়েকবারই নিয়োগ প্যানেল বাতিল করে দিয়েছেন এরকম উদাহরণ আছে। আজকাল অবশ্য এইসব অভিজ্ঞতা থেকে 'শিক্ষা' নিয়ে অনেক 'আঁটোসাঁটো' ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতেও শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রভাব আছে, যার ধরনটি শুধু মাঝেমধ্যে বদলে যায়। এইভাবে নিযুক্ত 'শিক্ষক' কেমন মনোযোগ সহকারে শিক্ষাদান করবেন তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের সরকার বাহাদুর প্রাথমিক-মাধ্যমিক — সব শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতি করার দরজা হাট করে খুলে রেখেছেন। বিধানসভা-জেলা পরিষদ-পঞ্চায়েত সমিতি-গ্রামপঞ্চায়েত — এগুলিতে নির্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশই শিক্ষক। আর যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও নির্বাচিত হতে পারেননি, হেরে গেছেন, সেরকম শিক্ষকের সংখ্যা এই সংখ্যার কয়েকগুণ। এমনিতেই অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষকদের সংখ্যা ছাত্র অনুপাতে নিতান্তই অপ্রতুল, তার উপর নির্বাচিত শিক্ষকরা স্কুলে নিয়মমাফিক আসা ব্যাপারটিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না। তা ছাড়া ক্ষমতাধারী দলের লেজুড় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই স্কুলে যখন খুশি আসার বা মাসে কয়েকদিন এসে বাকি দিনগুলোর সই করার অধিকার জন্মে যায়। তাই যেসব শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসতে বাধ্য হন, তারা নিজেদের প্রতারিত বলে মনে

করেন। শিক্ষকদের অধিকাংশই দিনভর রাজনীতির মুখরোচক চর্চাতে ব্যস্ত — অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনারা গ্রাম্য রাজনীতির নিয়ন্ত্রকও - এনারা ছাত্রদের শেখানো-পড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, আদর্শ শিক্ষক হওয়ার চেষ্টা করবেন, একথা পাগলেও মনে হয় আজকাল আর বিশ্বাস করে না।

দুই : শিক্ষাকেন্দ্র যখন ব্যাবসাকেন্দ্র

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতীত ভারতের তপোবন শিক্ষাকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে কেমন করে চালানো যায়, তা হাতে-কলমে দেখিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষাঙ্গন এক পবিত্র স্থান -- এই বিশ্বাস ছিল তাঁর মনে। এখন সারা রাজ্যের সমস্ত বিষয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতি, তাই সেই নিয়মে সমস্ত মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিই আজকাল রাজনীতির ভিত্তিতে 'নির্বাচিত' হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনেও অন্যান্য সমস্ত নির্বাচনের মতো বোমা-বুথ-জ্যাম--- এসব চালু হয়ে গেছে। রাজনৈতিক দলের স্বার্থ দেখার জন্য কিছু মানুষকে এই কমিটিগুলিতে ঢোকানো হয় --- যাদের সঙ্গে শিক্ষা-ফিক্ষার কোনো দূরতম সম্পর্কও নাই। সেজন্য যথারীতি ম্যানেজিং কমিটির সদস্য থেকে সেক্রেটারি -- সবাই নিজেদের দলের স্বার্থ দেখে সব সিদ্ধান্ত নেন, স্কুল বা ছাত্রদের কথা ভাবা এখানে এক অবান্তর বিষয়।

শিক্ষকদের অধিকাংশই চাকুরি পেয়েছেন রাজনৈতিক নেতাদের সক্রিয় সহযোগিতায় -- তাঁদের অনেকেই আবার সরাসরি রাজনীতি করেন --- কাজেই স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য অনুযায়ী বিভিন্ন দলভাগ থাকবে, সেই দলগুলির মধ্যে সদাসর্বদা মৌখিক লড়াই চলবে, মাঝে-মধ্যে সেই লড়াই হাতাহাতি বা তার চেয়েও বড়ো কিছুতে পরিবর্তিত হবে— রাজনীতি সচেতন বঙ্গদেশে এ কোনো নতুন কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মচারী সংগঠনই সরাসরি এক একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, আসলে এগুলি রাজনৈতিক দলগুলির এক একটি লেজুড় মাত্র। এই পরিস্থিতির মধ্যেও ছাত্রদের শেখার যেটুকু সম্ভাবনা থাকে, তাও শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের একটি ক্ষমতাশালী অংশের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাবসা করার কারণে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থাকা নানান ফাঁক-ফোকরের সুযোগ নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট স্কুলগুলির ব্যাবসা বা পাস করিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি নিয়ে শিক্ষিত বেকার টিউশন মাস্টারের ছাত্র ভাঙিয়ে নিয়ে এসে নিজের বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরগুলি ছাত্রদের বার বার অভ্যাস করিয়ে দেওয়ার জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় স্কুলেরই ক্লাসঘরে স্কুলেরই বেঞ্চ, চেয়ার, ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করে চালানো ক্লাস নেওয়ার স্টাইলে শিক্ষকদের 'প্রাইভেট টিউশন' ব্যাবসা নয়— অন্য আর একটি ব্যাবসার ব্যাপারে একটু আলোকপাত করা যাক। শিক্ষা নিয়ে চালানো এই ব্যবসা চলে সারা বাংলার প্রায় সমস্ত স্কুলে, অথচ এই ব্যাবসা নিয়ে সামান্য আলোচনাটুকুও হয় না। বিষয়টি হল স্কুলের 'বুকলিস্ট' অর্থাৎ প্রতিটি শ্রেণির পাঠ্যবই ও সাহায্যকারী বইয়ের

তালিকা তৈরি। প্রতিটি স্কুল নুতন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এরকম একটি তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করে। অতীতে দেখা যেত কোনো একটি স্থানীয় বই-দোকান এই তালিকাটি ছাপানোর খরচ দিত, তার দোকানের বিজ্ঞাপনের অঙ্গ হিসাবে। এখন অধিকাংশ স্কুলের প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বই নির্বাচিত হয় নিলামে, অর্থাৎ যে প্রকাশক সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ দেবেন, তার বইটিই নির্বাচিত হবে। স্কুলের নির্দিষ্ট শ্রেণিটিতে কতজন ছাত্র পড়াশোনা করে, তার উপর বইয়ের বিক্রি নির্ভর করে — সেজন্য এই বিষয়টি নিলামের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়, তবে বইয়ের Quality এক্ষেত্রে কোনো বিবেচনাধীন বিষয় নয়। স্বভাবতই বই যত ফালতু হবে— তার প্রকাশক তত বেশি করে ঘুষ দিতে রাজি থাকবে। এই কালো টাকার ভাগ কারা কতটা পায়, তা নিয়ে আলোচনা করার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হল এই ধরনের ব্যাবসা বন্ধ করার চেষ্টা করা। কোনো একটি বইকে পাঠ্যবই হিসাবে নির্বাচিত না করে প্রতিটি বিষয়ে চার-পাঁচটি বইয়ের তালিকা প্রকাশ করলে ছাত্ররা তার মধ্যে থেকে যে- কোনো একটি বই কিনতে পারে। এই কথা আলোচনা করার সময় জনৈক শিক্ষকের বক্তব্য — নির্দিষ্ট একটি বই হাতে না থাকলে ছেলেদের পড়াব কীভাবে? অর্থাৎ প্রতি বছর একই শ্রেণির একই বিষয় ছাত্রদের পড়িয়ে পড়িয়েও এমনই অবস্থা যে হাত থেকে বই ছাড়িয়ে নিলে শিক্ষকদের পড়ানোর ক্ষমতা চলে যায়! আসলে শ্রেণিকক্ষে পৌঁছে Text বই হাতে ধরে কিছুটা Reading পড়ে যাওয়াই ছাত্রদের 'পড়ানো' বলে অনেক শিক্ষক মনে করেন, সেজন্যই এই সমস্যা।

এত সব বিষয়ে আলোচনা শুনে যে প্রশ্নটা সবার আগে মনে আসবে — তা হল এতই যদি খারাপ অবস্থা, তাহলে সারা পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে এত ছেলে পাস করছে, ডিভিশন, স্টার, র‍্যাংক পাচ্ছে কী করে? ছাত্ররা পাস করছে, ডিভিশন -স্টার পাচ্ছে, কিন্তু স্কুল থেকে কিছু শিক্ষা পাচ্ছে কি? মুষ্টিমেয় কিছু স্কুল বাদ দিলে পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ স্কুলে ছাত্ররা ভ রতি হয়, ভ রতি হতে হয়, তাই। যেসব ছাত্রের অভিভাবকরা সচেতন এবং আর্থিক সংগতি সম্পন্ন — তারা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় ছাত্রদের যতটা সম্ভব শেখানোর ব্যবস্থা করেন, আর অশিক্ষিত, অসচেতন বা সীমাবদ্ধ আর্থিক সংগতির অভিভাবকের স্কুল-নির্ভর সন্তানরা কিন্তু হারিয়েই যাচ্ছে। তাই স্কুলের ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিলেও সফল ছাত্রদের সাফল্যের পেছনে স্কুলগুলির নিজস্ব অবদান অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু শূন্যের খুব কাছাকাছি। আর মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের Rank? নিন্দুকেরা বলেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের Rank ব্যাপারটি নাকি সাজানো। প্রথমদিকের জনা চল্লিশ-পঞ্চাশ ছাত্রের নাম, স্কুলের নাম, জেলা ও প্রাপ্ত নাম্বার টুকে নিয়ে উচ্চতম স্তরে আলোচনা করে ঠিক করা হয় এদের মধ্যে কোন্ জেলার কোন্ স্কুলের কোন্ ছাত্রকে এবারে কোন position দেওয়া হবে। সেই সিদ্ধান্ত মতো দু-দশ নাম্বার কমিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে আগে থেকে ঠিক করা position -এ এইসব ছাত্রদের fit করা হয়। এটাও এক ধরনের political decision.

তিন : শিক্ষকদের পোশাক ও সাজগোজ— চলতি বিতর্ক

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের এবং জীবিকার জন্য কিছু নিজস্ব নিয়মকানুন থাকে, থাকা উচিতও— যেগুলি সেই প্রতিষ্ঠান বা জীবিকার প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যেগুলির ধরন একান্তভাবে সেই প্রতিষ্ঠানের বা জীবিকার নিজস্ব। যেমন একজন কনস্ট্রাকশন কর্মীর কর্মক্ষেত্রে হেলমেট আর সহজে চলাফেরা করার উপযোগী পোশাক পরা অবশ্য প্রয়োজনীয়। একজন ডাক্তারবাবুর অপারেশন করার সময় দস্তানা, অ্যাপ্রন, মাস্ক ইত্যাদি পরিধান করা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলেই তাঁদের পেশায় এই ধরনের পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই রকম ভাবে একজন নার্স বা একজন সৈনিক বা একজন পুলিশের জন্যও পোশাক-আশাক সংক্রান্ত নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি করা হয়েছে। অনেকটা একই রকম কারণেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসার পোশাক-আশাকের ধরন এবং রং অনেক সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্তু স্কুলের এই ধরনের নিয়ম পালন করা নিয়ে কমবয়সি শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মতান্তর-মনান্তরের ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটে। কোথাও উগ্র সাজ করা নিয়ে, কোথাও লিপিস্টিক পরা নিয়ে, কোথাও কোনো শিক্ষিকার সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্রীদের ও অন্যান্য শিক্ষিকাদের মতো একই ধরনের ও রঙের পোশাকের বদলে রঙিন শাড়ি বা শালোয়ার কামিজ পরা নিয়ে, কোথাও আবার সালোয়ার কামিজের সঙ্গে ওড়না পরা না পরা নিয়ে, এমনকি কোথাও বা কোনো শিক্ষিকার স্কুলে বোরখা পরে মুখ ঢেকে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া নিয়ে লাগাতার গণ্ডগোলের খবর বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া যায়। যখনই কোনো শিক্ষিকার পোশাক বা সাজগোজ নিয়ে কথা ওঠে, তখনই সবাই রে রে করে সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে পরিচালক মণ্ডলীকে স্বৈরাচারী, সেকেলে, পুরুষতান্ত্রিক পাষণ্ড, অত্যাচারী ইত্যাদি নানান বিশেষণে ভূষিত করার জন্য ব্যাগ্র হয়ে ওঠেন। শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত আধুনিকা শিক্ষিকাদের কাছে একটি স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হলেও, গ্রামের মানুষের চোখে বহিরাগত শিক্ষিকার উগ্র সাজপোশাক অবচেতন মনের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয় মেয়েদেরই বিশেষ কিছু জীবিকার কথা। তাই তারা নিজেদের স্কুল পড়ুয়া মেয়েরা যাতে এগুলি নকল করতে শিখে পরবর্তীকালে নানান সমস্যায় না পড়ে যায় — সেই চিন্তাতে এর বিরোধিতা করেন। যতই যুগের পরিবর্তন হোক, ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবচেতন মনে অনুসরণ করবেই, আর গ্রামের স্কুলে পড়া মেয়েদের উগ্র সাজগোজ করা বা দামি পোশাক পরার স্বপ্ন তৈরি হলে ভবিষ্যৎ জীবনে তা শুধু তাদের হতাশাই বাড়াবে। অথচ এই বিষয়ে কোনো রকম আলোচনা শুরু হলেই সবার আগে ওঠে মহিলাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা তো সব ব্যক্তিরই থাকা উচিত, তা তো শুধুমাত্র একজনের হতে পারে না। স্কুলের শিক্ষিকাদের মতোই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকা উচিত-তাই তারাও প্রশ্ন করতে পারে যে, প্রতিদিন একঘেয়ে রঙের স্কুলড্রেস পরতে তাদের বাধ্য করা হবে কেন? একজন সৈনিক, একজন পুলিশ বা একজন নার্সেরও তো ইচ্ছে হতে পারে ইচ্ছে মতো সাজপোশাক পরে বা সাজগোজ করে কর্মক্ষেত্রে

কাজ করার। সিনেমার হিরোদের নকল করে বড়ো বড়ো ঝাকড়া চুল রাখা মিলিটারি সৈনিক, রঙিন টি শার্ট পরা পুলিশ বা সালোয়ার কামিজ পরা, ওড়না ওড়ানো, শ্যাম্পু করা উড়ু উড়ু চুলের নার্সকে কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মক্ষেত্রে মেনে নেবেন তো? কিংবা ধরুন কোনো কো-এডুকেশন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে বা কলেজে সাজপোশাক বা সাজগোজ করা নিয়ে গোঁ ধরে থাকা শিক্ষিকার কোনো পুরুষ সহকর্মী যদি বারমুণ্ডা হাফ প্যান্ট ও টি শার্ট পরে কর্মস্থলে গিয়ে তার লোমশ পা-দুটি নাড়াচাড়া করতে করতে ক্লাস নেন, ব্যক্তি স্বাধীনতার সওয়ালকারিগণ তা মেনে নেবেন তো?

চার : বিশেষজ্ঞদের হাতে গিনিপিগ

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে গত সাতান্ন বছরে বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের মতামত নিয়ে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের কমিশন বসিয়ে, বারে বারে কয়েক বছর অন্তর অন্তর প্রায় নিয়মিতভাবে আমাদের রাজ্যে শিশুশিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে আগের 'ভুল'গুলি বাতিল করে' নূতন পদ্ধতি' চালু করা হয়েছে। এই কাজে অনেক সময় পুরো পদ্ধতিটি বদলে ফেলা হয়েছে, তবে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাসগুলির মধ্যে ছোটো-বড়ো নানা পরিবর্তন করা হয়েছে বা শিক্ষাবর্ষ বদলে দেওয়া হয়েছে। ১০+২+৩, ১০+১+৩, ৮+৩+৩, ১০+২+২(৩), ১০+২+৩, ১০+১+১+৩—এইরকম নানা বিন্যাসে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার বর্ষসূচি নির্বাচন করা হয়েছে। নিন্দুকেরা অবশ্য বলেন যে অনেক সময় নাকি সামান্য অদলবদল করে নিয়ে আগের বাতিল পদ্ধতি বা বিষয়কেই নতুন সংযোজন বলে চালানো হয়েছে। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ঘন ঘন সিলেবাস বদলানোর পেছনে কিছু যুক্তি পাওয়া গেলেও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এই যুক্তিগুলি খাটে না। সবসময় ছাত্রছাত্রীদেরই এজন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য চোকাতে হয়— তবে কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য অনুযায়ী ছাত্রদের গিনিপিগ বানিয়ে এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করারও নাকি প্রয়োজন আছে! প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরাজি রাখা ভুল, আধাভুল অথবা ঠিক —এই সিদ্ধান্ত নিতেই পরীক্ষা চলল পঁচিশ বছর। কয়েক বছর আগে ডিসেম্বর থেকে শিক্ষাবর্ষ নিয়ে আসা হল জুন মাসে। এখন আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। ১০+২ শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ও ফলাফলের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট স্কুলের উপর দিয়ে সরকার উচ্চমাধ্যমিক সংসদের উপর শুধু দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব দিচ্ছেন। স্বনির্ভর কলেজের মতো স্বনির্ভর স্কুল করার এক পদক্ষেপ হিসাবে সম্ভবত: এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অথচ এত 'বিজ্ঞ' ব্যক্তিদের কেউই গিনিপিগের স্থান নেওয়া ছাত্রদের উপর এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রভাব, তাদের সুবিধা-অসুবিধা বা ভবিষ্যৎ জীবনে উচ্চশিক্ষার বা জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে এইভাবে হঠাৎ করে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থা বা সিলেবাস বদলের ফল কী হয়— তা নিয়ে ভাবেন না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে তা আমাদের রাজ্যের থেকে খারাপ; ICSE বা CBSE বোর্ডের শিক্ষাপদ্ধতি ফালতু — এইরকম সব ফাঁকা অহংকারে আমরা চিরকালই খুব ফেঁপে আছি— থাকিও, কিন্তু কোনো সর্বভারতীয়

পরীক্ষার ফলাফল তার উলটো কথা বলে। একটি পদ্ধতি চালু থাকা মানে সেই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত থাকেন শিক্ষক, ছাত্র — সবাই। কোনো একটি নতুন পদ্ধতি চালু করার সময় সবাই থাকেন অনভিজ্ঞ, আর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সময় লাগে। বাজারে ভালো বই আসতেও সময় লাগে। কয়েকবছর অন্তর প্রায় নিয়মমাফিকভাবে চলা ছাত্রদের নিয়ে এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোনো দিনই শেষ হয় না, এই জিনিস ভবিষ্যতেও অনাদিকাল ধরে চলতেই থাকবে। এই ধরনের পরিবর্তনে অন্য কাউকে হয়তো তেমন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় না, তবে এই সবের মাঝে কয়েকটি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের বলি হতে হয়, এই যা।

যে কোন সময়ই শিক্ষাপদ্ধতি বদল বা সিলেবাস বদলের পরবর্তী পর্বটি হল বই বদল হওয়া। এভাবে বারবার বই বদলালে কার কার কী কী লাভ হয়—তা নিয়ে একটু ভাবা যাক। পুস্তক ব্যবসায়ী আর নিজের স্কুলে বই চালানোর নিলাম ডেকে 'সাম্মানিক' নেওয়া স্কুলের মাস্টারমশায়দের একাংশের হয় সরাসরি আর্থিক লাভ। নো বই লেখক শিক্ষক মশায়দেরও হাতে কিছু নোটের আমদানি হয়। নতুন কোর্সের নাম ভাঙিয়ে গৃহশিক্ষক মহাশয়দেরও রেট বাড়াতে সুবিধা হয়। শিক্ষকদের নুতন কোর্সের উপর ট্রেনিং দেওয়ার জন্য দেশি- বিদেশি অর্থের বন্দোবস্ত করে তা লুঠ পাট করার কাজে নিযুক্ত কর্তাব্যক্তিদের হাতেও ভালোই অর্থাগম হয়। অন্যদিকে অসুবিধায় পড়েন সেইসব ছাত্র ও অভিভাবকরা— যারা বছর বছর নতুন নতুন বইয়ের সেট কেনার ক্ষমতা রাখেন না। পুরানো বই পড়ে পড়াশোনা করার চিন্তা নাকি এখন Back dated হয়ে গেছে। আর শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে এভাবেই নাকি শিক্ষা প্রসারিত হয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কাছে পৌঁছে যাবে ! এরপর কেউ যদি 'বিশেষজ্ঞ' কথার অর্থ করেন 'বিশেষরূপে অজ্ঞ' — তাকে ভুল প্রমাণ করা যাবে তো?

পাঁচ : ছাগল চাষ সংক্রান্ত কথোপকথন

কথা হচ্ছিল আমাদের রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এক উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তির সঙ্গে। ভদ্রলোক একটি বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি প্রাপ্ত, সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে অনেকটা সময় ওনার বক্তব্য শোনার পর জিজ্ঞাসা করলাম— এই যে এসসি , এসটি, ওবিসি কোটা — এগুলি বাদ দেওয়ার পরে যে কয়টা শিক্ষকদের চেয়ার ফাঁকা থাকে, তাতে ভালো ছাত্রদের নেওয়া হচ্ছে না কেন? যেমন ধরুন স্কুলে শিক্ষকদের অনেক চেয়ার সাধারণ গ্রাজুয়েটদের জন্য সংরক্ষণ করছেন, কেন? উনি উত্তর দিলেন — মাধ্যমিক স্তরের পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর জন্য আমাদের উচ্চ-শিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন নেই, তাই। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম — কারা সাধারণ গ্রাজুয়েট হয় ? ছাত্রদের বুদ্ধি-শুদ্ধি আর রেজাল্টের সঙ্গে তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বেছে নেওয়া লাইনটির সরাসরি সম্পর্ক আছে। দু-একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে সব ছাত্র ও তাদের অভিভাবকই চায় যে মাধ্যমিক পাস করে ছাত্রটি পড়ুক বিজ্ঞান শাখায়। কিন্তু রেজাল্টের কারণে যারা সে সুযোগ পায় না, তারা বাণিজ্য বা কলা বিভাগে পড়ে। এদিকে বিজ্ঞান বিভাগে যারা পড়ে, উচ্চমাধ্যমিকের পর তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। যারা এই লাইনগুলিতে ভরতি হতে পারে না, তারা আরও যেসব

টেকনিক্যাল শিক্ষার লাইন আছে, সেগুলিতে ভরতি হতে চেষ্টা করে। তাতেও সুবিধে করতে না পারলে কলেজে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত ও জীব বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন কোর্সে ভরতি হয়। এতেও যারা চান্স পায় না, তারা বিজ্ঞানের সাধারণ স্নাতক কোর্সে ভরতি হয়। এছাড়া বিজ্ঞান বিভাগে সুবিধেজনক রেজাল্ট না হওয়ার কারণে কিছু ছাত্র আবার উচ্চমাধ্যমিকের পর কলা বা বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক হওয়ার জন্যও ভরতি হয়।

অন্যদিকে কলা বিভাগে যারা উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়, তাদের প্রথম পছন্দ ইংরাজি অনার্স। এরপর ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের অনার্স কোর্সের হাজার হাজার আসন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে রয়েছে ভরতি হওয়ার জন্য। উচ্চমাধ্যমিকে কম নাম্বার পাওয়ার কারণে এগুলিতেও যারা অনার্স পায় না, তারা পড়ে কলা বিষয়ের সাধারণ গ্রাজুয়েশন কোর্স। একই কথা খাটে বাণিজ্য বিষয়েও। সেজন্য দেখা যায় নেহাত গবেটরা ছাড়া বাকিরা অন্তত : কোনো না কোনো বিষয়ে অনার্স নিয়ে কলেজগুলিতে পড়তে সুযোগ পায়। এই অবস্থায় কী ধরনের 'মাথা'কে আপনারা শিক্ষাদান করার কাজে লাগাচ্ছেন সাধারণ স্নাতকদের জন্য শিক্ষকতার কাজ সংরক্ষন করে? ক্লাস ফাইভ থেকে নাইন — এই সময়টাতেই ছেলে-মেয়েদের সবচেয়ে বেশি করে নতুন নুতন বিষয় শিখতে হয়— ব্যাকরণ থেকে গণিত — সব বিষয়েই। এই ব্যাপারটিকে হালকাভাবে নিচ্ছেন কেন?

শিক্ষাবিদ ভদ্রলোক বয়স্ক, নেতৃস্থানীয় মানুষও, সেইজন্যই বোধহয় এতক্ষণ ধরে আমার কথাগুলি শুনছিলেন। কিন্তু কিছুটা রেগে যাচ্ছেন, তা বোঝা যাচ্ছিল। উনি বললেন — ভালো ছাত্র হলেই যে ভালো শিক্ষক হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা আছে?

আমি সবিনয়ে বলি, না– তা নেই। তবে উলটোটাকেই বা ঠিক বলে ভেবে নিচ্ছেন কেন? অর্থাৎ খারাপ ছাত্র হলেই তিনি ভালো শিক্ষক হবেন? সব সময় সম্ভাব্যতার ব্যাপারটি যুক্তি দিয়েই তো বিচার করতে হয়। যিনি পাঠ্য বিষয়গুলি ভালোভাবে বোঝেন বা বোঝার ক্ষমতা রাখেন — তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যকে বোঝানোর ক্ষমতার অভাব থাকার কারণে অন্যদের বিষয়গুলি সঠিকভাবে বোঝাতে পারেন না। এটা ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশিক্ষণ দিলে এবং ব্যক্তির নিজের চেষ্টা থাকলে এই অক্ষমতা অনেকটাই সারিয়ে তোলা যায়, কারণ প্রশিক্ষণ নেওয়ার মতো মস্তিষ্ক তাঁর আছে। কিন্তু যিনি নিজেই পাঠ্য বিষয়গুলি জানেন না এবং সেগুলি ভালোভাবে বোঝার ক্ষমতাও যার নেই — তিনি কীভাবে অন্যদের বোঝাবেন? এনাদের প্রশিক্ষণ দিয়েও তো কোনো লাভ হবে না – কারণ প্রশিক্ষণের বিষয়গুলি নেওয়ার মতো ক্ষমতা এনাদের মস্তিষ্কের নাই। ভালো ছাত্রের খারাপ শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পাঁচভাগ হলে খারাপ ছাত্রের খারাপ শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ! আর এভাবে ভালো ছাত্রদের বাদ দিয়ে খারাপ ছাত্রদের শিক্ষকতার চাকুরি দেওয়ার প্রথা তো প্রাথমিক, মাধ্যমিক থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় – সবক্ষেত্রেই চলছে। স্কুলগুলিতে দেখা যায় নিজের অক্ষমতা ঢেকে রাখার জন্য বা চেয়ারের ভ্যানিটি বজায় রাখার জন্য ছাত্রদের মারধোর করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন কিন্তু এইসব শিক্ষকমশায়রাই। একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।

শিক্ষাবিদ ভদ্রলোক বেশ রেগে গেছেন বোঝা গেল। বললেন — তাহলে ভালো ছাত্র ছাড়া আর কারও তো পড়াশোনা করে লাভ নাই।

বোঝানোর চেষ্টা করলাম — পড়াশোনা করার দরকার শিক্ষালাভ করার জন্য। কোনো সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান কি প্রতিটি গ্রাজুয়েটকে শিক্ষকতার চাকুরি দিতে পারবে? নিশ্চয়ই পারবে না। সেজন্য যার যা যোগ্যতা — তার স্থান তো সেখানেই হওয়া উচিত। শিক্ষাবিদ ভদ্রলোক বললেন — শুধু এম. এ. পাস করলেই কেউ বি.এ. পাস ছাত্রের চেয়ে ভালো ছাত্র — তা ধরে নিচ্ছেন কীভাবে?

বললাম — এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা এমনই যে, কোনোভাবে কেউ একবার উচ্চমাধ্যমিক পাস করতে পারলে, সুযোগ পেলে, শুধুমাত্র লেগে থাকার অভ্যেস আর উপযুক্ত স্থানে তৈলমর্দনের জ্ঞান থাকলে পি. এইচ. ডি ডিগ্রি পাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। সবই ঠিক কিন্তু এক্ষেত্রে 'অপেক্ষাকৃত ভালো' হিসাব করাটা জরুরি। সেই হিসাব করতে গেলে অনার্স পাওয়া -- না পাওয়ার ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দিতেই হবে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্টকে। তা ছাড়া আজকাল যা চলছে — অর্থাৎ মিউজিক, নিউট্রিশন ইত্যাদি সব বিষয়েও স্কুলগুলিতে কিছু কিছু শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে , এতেই বা কি লাভ হচ্ছে? স্কুলে তো এসব বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ঢোকানো হয়েছে। আর গান-বাজনায় আদৌ কোনো আগ্রহ থাক বা না থাক, শুধু অল্প আয়াসে বেশি নাম্বার তোলার জন্য মুখস্থ নির্ভর ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিষয়গুলি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়তে চান। এইসব বিষয় পড়ানোর জন্য নিযুক্ত শিক্ষকরা নিজেদের বিষয়ের কয়েকটি ক্লাস বাদ দিলে বাকি সময়টা কী পড়াবেন?

এত প্রশ্নের সামনে পড়ে শিক্ষাবিদ-নেতা মশায় গুম হয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড, তারপর ঠোঁটের এক কোনো একটু বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

দাড়ি হল জ্ঞানের প্রতীক —এই ধারণা থেকে দাড়ি থাকলেই জ্ঞানী হন — সম্ভবত এইরকম এক বিশ্বাসের উপর ভরসা করে একটি বিশেষ রঙের কিছু রামছাগল দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হালকা-মাঝারি-ভারী সবরকমের চেয়ারগুলিকে গত কয়েক দশক ধরে ভরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। এনারাও তাই সব জায়গায় নিজ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত জীবটিকে নির্বাচন করেন। শিক্ষা দপ্তরেই আবার এহেন জীবেদের সবচেয়ে বেশি আনাগোনা। এহেন শিক্ষকরা যেসব ছাত্র তৈরি করবেন, তারাও শিক্ষকদের সমগোত্রীয়ই হবেন। যাঁরা নিজেরাই 'বিশেষ যোগ্যতা'র কারণে নিযুক্ত, রাজনীতির চশমা লাগানো এইসব নেতা কাম শিক্ষাবিদদের কী করে বোঝানো যাবে যে পা, শিং, চোখ বা গায়ে লোম থাকার বিষয়ে সংখ্যাগতভাবে মিল থাকলেও গোরু আর ছাগল এক নয়। চাষের কাজে বা দুধ উৎপাদনের কাজে গোরুই প্রয়োজন, ছাগলেরও প্রয়োজন আছে — তবে তা অন্যত্র। ছাগল দিয়ে গোরুর কাজ হয় না — তবুও এ রাজ্যের সর্বত্র চালানো হচ্ছে ছাগল দিয়ে চাষ আবাদের কাজ। এই রকম চাষাবাদের ফলন দেখে হা-হুতাশ করে লাভ কি?

ছয় : প্রসঙ্গ উচ্চশিক্ষা

গত কয়েক বছর ধরেই সরকার বাহাদুর উচ্চশিক্ষা খাতে খরচ কমানোর কথা বলছেন। এ ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য ওনারা সবচেয়ে বেশি উৎসাহী— তা হল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন নিজেদের খরচ নিজেরাই তুলে নেয়, সরকারকে কোনো আর্থিক দায় যেন বইতে না হয়। সরকার 'শিক্ষা'কে কোনো দায়িত্ব বলে মানতে চাইছেন না, অন্য হাজারও পণ্যের মধ্যে একে একটি পণ্য বলেই গণ্য করছেন। সেজন্য ধীরে ধীরে অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়ীদের মতো শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের হাতে শিক্ষাকে তুলে দিতে চাইছেন। এই উদ্দেশ্য পূরণের প্রাথমিক পর্যায় পরীক্ষা নেওয়া, রেজাল্ট বের করা ও ডিগ্রি দেওয়ার অধিকার কলেজগুলিকে দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সমস্ত আইনি বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এখনকার চালু ব্যবস্থায় সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ও সরকারের আয়ত্বাধীনে থাকা কোনো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা (যথা বিশ্ববিদ্যালয়) অনেকগুলি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠরত সমস্ত ছাত্রের পরীক্ষা নেওয়া থেকে ডিগ্রি দেওয়ার মতো যেসব দায়িত্ব পালন করে চলে, সেই পুরো ব্যবস্থাটি আমূল বদলে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। পশ্চিমি কেতার শিক্ষা ব্যবস্থাতে এইরকম প্রথাই চালু, তবে আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা কতখানি কার্যকর হবে — তা নিয়ে আলোচনাই শুরু হল না, অথচ তলে তলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। এখন শুধু সেই সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করার 'উপযুক্ত' পরিবেশ ও সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। যেসব দেশে জনসংখ্যা একই জায়গায় বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে আছে বা কমে যাচ্ছে, যেখানে কেউ কর্মহীন থাকলেই সরকারকে মাসে মাসে মোটা টাকার ভাতা বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় — তাদের সঙ্গে এক জনাকীর্ণ, পরমাণু বিভাজনের গতিতে বেড়ে চলা জনসংখ্যার এক দেশ—যেখানকার অর্ধেকের বেশি মানুষ লিখতে -পড়তে জানে না আর স্বল্পাহারে বা অনাহারে দিন কাটায় — তার তুলনা চলে না। দুই দেশে একই ধরনের ব্যবস্থাপনা চালানোর কথা যারা ভাবেন— তাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে বোধ হয় ভুল করবে না। অন্যদিকে যে বাবা নিজের ছেলেমেয়েদের হাতে তাদের নিজস্ব গাড়ির চাবি বা ক্যামেরা-মোবাইল তুলে দেন, আর যে বাবা সন্তানদের দু-বেলা পেট ভরে ভাত বা রুটি দিতে পারেন না — তারা একই দেশের অধিবাসী হলেও তাদের একই ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা হবে কোনো যুক্তিতে?

কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার বাহাদুর-দ্বয়ের উচ্চশিক্ষা খাতে নাকি প্রচুর খরচ, দিতে হয় প্রচুর ভর্তুকি! কোনো উচ্চশিক্ষা খাতে কী খরচ, এই ব্যাপারটি প্রথমেই বুঝে নেওয়া যাক। সরকারের উচ্চশিক্ষা খাতে যা খরচ হয় তার অধিকাংশই হল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পোষার খরচ (বেতন, ডিএ, ঘরভাড়া, ডাক্তারি খরচ থেকে পেনশন, গ্রাচুইটি — এইসব)। উচ্চশিক্ষার শিক্ষকরা এখন যেকোন ধরনের যোগ্যতার ও দায়িত্বের সরকারী কর্মচারিদের চেয়ে বেশি বেতন পান। উচ্চশিক্ষার জন্য নিযুক্ত এইসব শিক্ষকদের কোয়ালিফিকেশন নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে কি? নাকি পবিত্র গঙ্গাজলের পবিত্রতার মতোই এটিও একটি প্রশ্নাতীত পবিত্র বিষয় ! বর্তমানে আমাদের রাজ্যে কর্মরত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অধ্যাপক'দের কতজন

NET বা SLET পাস করে নিযুক্ত হয়েছেন, আর এর বাইরে আইনের বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর দিয়েই বা কতজন নিযুক্ত হয়েছেন— সরকার বাহাদুর তা বলবেন কি? বলবেন না-- কারণ বাস্তব হল মামা-কাকা ধরে আর নেতাদের ধামা ধরে ধরেই কিন্তু নিযুক্ত হয়েছেন অধিকাংশ উচ্চশিক্ষার শিক্ষক। এইসব নিযুক্তির সময় এমন এমন বিচিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় --- যা এইসব ধামাধরা ব্যক্তিদেরই কেবল থাকে। এছাড়া নানান সরকারি সংস্থার আর্থিক সহায়তায় চালানো নানান scheme -এ কাজ করার পর স্থায়ী হওয়া, adhoc থেকে স্থায়ী হওয়া — আইন বাঁচিয়ে দুর্নীতি করার হরেক বিচিত্র ব্যবস্থা আছে। তাও আবার এই সমস্ত অধ্যাপক নিয়োগের interview-তে নির্বাচিত ব্যক্তিটির bio-data সাধারণত যেসব পরীক্ষার্থী নির্বাচিত হতে পারেননি — তাদের সবার চেয়ে খারাপ হয়, যার প্রধান কারণ ছাত্রজীবনে মিটিং-মিছিল-বোমাবাঁধার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে পড়াশোনা করার সময় এনাদের অনেকে পাননি। এছাড়াও আরও বহু বিষয় ভাবার আছে। গত পে-কমিশনের মাধ্যমে নুতন হারে বেতন বৃদ্ধি করার সময় সরকার বাহাদুর (প্রথমে কেন্দ্র পরে রাজ্য) কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের গুণগত মানের প্রসঙ্গ না তুলে কেবলমাত্র অন্যান্য সরকারি অফিস, প্রাইমারি, সেকেণ্ডারি বা হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের মতো একইভাবে কর্মস্থানে আসা ও যাওয়ার সময় হাজিরা খাতায় সই করার নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যথারীতি 'অর্জিত' বা 'ভোগকরা' যে-কোনো সুবিধা হারানোর উপক্রম হলে যা হয় — দলমত নির্বিশেষে সমস্ত কলেজ-ইউনিভারসিটির শিক্ষককুল এই 'অগণতান্ত্রিক' 'অসম্মানকর' নির্দেশের বিরুদ্ধে রে রে করে তেড়ে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলেন। সমস্ত মিডিয়াগুলো এক্ষেত্রে শিক্ষকদের পক্ষে সওয়াল করতে লাগল। প্রশ্ন জাগে— কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কি ভিন গ্রহের বাসিন্দা, যে তাদের জন্য অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা রেখে দিতে হবে? আসলে এনারা কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কোনো প্রমাণ রাখতে চান না। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের বক্তব্য হল -- প্রতিদিন Attendance Register -এ সই করা ওনাদের পক্ষে মর্যাদা হানিকর। তা ছাড়া ক্লাস নেওয়া ছাড়াও অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ওনাদের সময় দিতে হয় — যার কোনো সময়-অসময় থাকে না। এই বক্তব্য দুটি অবশ্যই বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। একজন I.A.S. অফিসার জেলাশাসকের সম্মান কি কোনো একটি কলেজের কোনো এক শিক্ষকের সম্মানের চেয়ে কম? জেলা শাসককেও কিন্তু Attendance রাখতে হয়। এছাড়া শিক্ষকদের বক্তব্য অনুযায়ী যদি ধরে নেওয়া যায় যে শিক্ষাদান করা ছাড়াও গবেষণা, লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করা ইত্যাদি কাজে ওনাদের এমনভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়, যে ওনাদের পক্ষে প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা ও খাতায় সই করা সম্ভব নয়, তাহলেও প্রশ্ন শেষ হয়ে যায় না। দীর্ঘকাল ধরে এইসব কথাগুলিকে সরকার থেকে সাধারণ মানুষ — সবাই বিশ্বাস করে এসেছে। অথচ বাস্তবে আমরা কি দেখছি ? এরাজ্যের কলেজ শিক্ষকদের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণার কোনো খবর শোনাই যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও তা খুবই অল্প সংখ্যক শিক্ষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব,

উপযুক্ত লাইব্রেরির অভাব, এসব অনেক ওজর বহুদিন ধরেই দেখানো হয়ে চলেছে, যদিও ই-মেল-ইন্টারনেটের যুগে এসব শুনে কেউ বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষও তাই বাস্তব অভিজ্ঞতায় এগুলিকে বানানো ওজর বলেই মনে করে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত আন্দোলনের সময় দাবি করেছিলেন I.A.S. অফিসারদের সমান ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও বেশি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা, কারণ ওনারা নাকি better qualified । অন্যান্য নানান বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বিভিন্নরকম জীবিকার সঙ্গে যুক্ত অন্য সবাইকে ওনারা নিজেদের চেয়ে lesser qualified ভেবে নিলেন কোন্ যুক্তিতে? বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশোনা করে ডিগ্রি অর্জন করা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কে বেশি qualified — তা তো সরাসরি বোঝা যায় না, তবে আমলা, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা — সবাই যে সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরে বিভিন্ন specialised line -এ পড়াশোনা করতে গেছেন, যেমন — পশ্চিমবঙ্গের এখনকার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা — তার ফলাফলগুলি তুলনা করলে কলেজ শিক্ষকদের এই দাবি হাস্যকর প্রমাণিত হবে না তো? মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের মতো basic পরীক্ষার পর সাধারণতঃ যারা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো কোনো technical line -এ প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না, তারাই কিন্তু general line -এ পড়াশোনা করতে যান — সেখান থেকে পরে কলেজ -বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন।

আমরা এমনই দুর্ভাগা যে, আমাদের রাজ্যে কোনোভাবে একবার কোনো চাকুরিতে কেউ ঢুকে গেলে তাকে সারাজীবন আর যোগ্যতার বা কর্মক্ষমতার কোনো পরীক্ষা দিতে হয় না। কারুর নির্দিষ্ট পদে থাকার যোগ্যতা বা তাকে দেওয়া নির্দিষ্ট কাজটুকু করার ক্ষমতা তার আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাকেও 'কর্মচারী বিরোধী' 'ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী' ইত্যাদি বলে গালি দেওয়া হয়। অথচ নিজেদের স্বার্থে কিছু কিছু দাবি করার সময় যেসব উন্নত পশ্চিমি দেশের তুলনা দেওয়া হয়, সেখানকার মতো যোগ্যতা সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলির সম্পর্কে কিন্তু সবাই নীরব থাকে। প্রতিটি কর্মরত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স ও বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মচারিদের এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা কোনো স্তরে আছে তার নিরপেক্ষ পরীক্ষা কয়েক বছর অন্তর অন্তর হওয়া উচিত। আমার ছাত্রজীবনে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষক ফলিত বিজ্ঞানের একটি বিষয় টেবিলে রাখা নোট দেখে পড়ানোর জন্য পাতা উলটোতে যাওয়াতে ওনার লালচে জীর্ণ পাতাটি নোট থেকে খুলে মেঝেতে পড়ে গিয়ে দু-খণ্ড হয়ে গিয়েছিল। এইসব শিক্ষকদের জন্যই বোধহয় বিদেশের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ছাত্রদের অধিকার দেওয়া থাকে প্রতি বছর শিক্ষকদের শিক্ষাদানের সক্ষমতা পরীক্ষা করে নাম্বার দেওয়ার, যার উপর নির্ভর করে শিক্ষকদের পদোন্নতি বা চাকুরির স্থায়িত্বের মতো বিষয়গুলি। উচ্চশিক্ষার নামে সরকারের যা খরচ হয়, তার সবটাই যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খরচ হয় এ দাবি কখনই করা যাবে না। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগতেই

পারে যে, কি লাভ আছে উচ্চ শিক্ষার নামে গাদাগাদা টাকা খরচ করে Political Science বা Accountancy অথবা ঢাক-ঢোলের মতো বিষয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পড়িয়ে গাদাগাদা মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার বেকার তৈরি করে? এমন তো নয় যে Politics-তে নামতে গেলে বা business করতে গেলে এবিষয়গুলিতে থাকা ডিগ্রি কোনো কাজে লাগে। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত মানুষও এদেশেরই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন - হচ্ছেনও। এম.কম. পাস করা ছেলেদের জন্যও ব্যাংকে বা কেরানিগিরির কোনো কাজে কোনো বিশেষ সুযোগ নেই। চাকুরি বা জীবিকা অর্জনের পথে কোনো সাহায্যই করতে পারে না এমন বিষয়গুলিতে উচ্চশিক্ষার জন্য গুচ্ছের আসন রেখে দেওয়া হয়েছে গাদাগাদা উচ্চশিক্ষিত বেকার তৈরি করার জন্য। উচ্চ শিক্ষার নামে এই অপচয়ের কোনো প্রয়োজন আছে কি ?

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে যেসব 'শিক্ষা' ছাত্ররা পেয়ে চলেছে, তাতে সত্যিকারের কি শিক্ষা হচ্ছে বা এইভাবে 'শিক্ষিত' ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে এইসব 'শিক্ষা' কী ধরনের 'কাজে' তাদের সাহায্য করে — তা ভাবার বিষয়। শহর -মফস্সলের অধিকাংশ কলেজই হয়ে গেছে রাজনীতির সূতিকাগার—আর তাই ভরতি হওয়ার দিন থেকেই বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড় সংগঠনে নাম লেখাতে হয়। ছাত্র রাজনীতিতে ঢোকার ব্যাপারে কোনো ছাত্রের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো দাম নেই —— প্রাথমিক 'অনিচ্ছাকে' নানান শেখানো কথা বা পদ্ধতি ব্যবহার করে বা ভয় দেখিয়ে কিছু 'বয়স্ক ছাত্র' 'ইচ্ছাতে' পরিণত করতে পারেন। ছাত্র ইউনিয়নের হাত দিয়ে খরচ করার জন্য বেশ মোটা টাকা রাখা আছে — সেজন্য ছাত্র ইউনিয়নে থাকতে পারলে হাতে অনেক টাকা 'নাড়াচাড়া' করার সুযোগ পাওয়া যায় — সেজন্য কিছু ছাত্র ইউনিয়ন দখল করে নিজেদের রাজত্ব চালু করতে আগ্রহী হয়। রাজনৈতিক দলগুলোও এই ধরনের অর্থলোভী, নীতিহীন ছাত্রদের মাধ্যমে কলেজ-ইউনিয়ন দখল করে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে চায়। ইউনিয়নের ইলেকশনের সময় যদি একটি রাজনৈতিক দলের লেজুড় ছাত্র সংগঠন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেল তো ভালো কথা, তা না হয়ে অন্য কোনো দলের হয়ে কেউ নমিনেশন জমা দিলে এবং ইলেকশন হলে বোমা-পাইপগান, মাথা ফাটাফাটি, রক্তারক্তি—— এসবে ছাত্রদের শুধু অংশ নিতে হয়— পরিকল্পনা করে ও নেতৃত্ব দেয় রাজনৈতিক দলের পোষা গুন্ডারা। এরই মধ্যে ছেঁড়া লুঙ্গি পরে বিড়ি ফুঁকে খিদে চেপে রাখা বাবার মলিন মুখটা মনে আসার কারণে দু চারজন ছাত্র এসবে না জড়িয়ে পড়াশোনা করতে চাইলেও কোনো উপায় নেই, ছাত্রনেতারা তা কিছুতেই হতে দেবেন না। কলেজ ইউনিয়ন সংক্রান্ত মারামারিতেই অধিকাংশ দিন ক্লাস হয় না — তার উপর যে দু-চার দিন ক্লাস হয় — সে দিনগুলিতেও ক্লাস চলাকালীনই লেজুড় ছাত্র সংগঠনগুলির দ্বারা ছাত্রদের মগজ ধোলাইয়ের জন্য 'ডায়াসিং' করা হয়। কলেজের ক্লাসরুম থেকে শিক্ষককে বের করে দিয়ে বদ্ধঘরের মধ্যে ছাত্রদের বন্দি করে চল্লিশোর্ধ্ব বয়েসের 'ছাত্র' ও বহিরাগত 'নেতা' বর্গের রাজনৈতিক ভাষণ শুনতে বাধ্য করার মতো ব্যাপারটিও বৈধতা লাভ করে সারা পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই। কোনো শিক্ষাবিদই প্রশ্ন করেন না যে-কোনো

যুক্তিতে ছাত্র-সংগঠনের বড়ো বড়ো পদাধিকারীরা হন অছাত্র, অনেকসময় প্রায় প্রৌঢ় বয়সের, সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা?

কলেজের শিক্ষকরাও এই ডামাডোলের সুযোগ নেন পুরোটাই। কলেজে পড়া বা পড়ানোর বালাই নেই — কিন্তু ছাত্রদের পরীক্ষা পারে বালাই থাকে। তাই অগত্যা কলেজের শিক্ষকদের কাছেই ছাত্রদের 'প্রাইভেট' পড়তে যেতে হয়। সেখানে শিক্ষকদের কাজ একটাই — গত বছর যেসব প্রশ্ন পরীক্ষায় পড়েছে সেগুলি বাদ দিয়ে এবছরের সম্ভাব্য প্রশ্নের সাজেশন বানিয়ে কিছু উত্তরের 'নোট' ছাত্রদের নগদ অর্থমূল্যের 'টিউশন ফি'র বিনিময়ে বিক্রি করা। কোনো পাঠ্যপুস্তক পড়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আজকাল ছাত্র- শিক্ষক-অভিভাবক কেউ মনে করেন না। নির্বাচিত প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে তা বমি করে ছাত্ররা পাস করে যায়, অনেকে ভালো রেজাল্ট ও করে, কিন্তু একে তো পাঠ্য বিষয়ের বাদ দেওয়া অধ্যায়গুলির বিষয়গুলি সম্পর্কে ছাত্রদের কোনো ধারণাই থাকে না, তায় কোনো বই না পড়ে শুধু প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করার কারণে মুখস্থ করা বিষয়গুলি ও ছাত্ররা সত্যি সত্যি কিছুই বোঝে না। আজকাল আবার 'নোট' মুখস্থ করার সময় ও কষ্ট পুরোপুরি লাঘব করার জন্য প্রশ্নোত্তরের মাইক্রো-জেরক্স করে নিয়ে পরীক্ষা হলে যাওয়ার পদ্ধতিও চালু হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেশ এগোচ্ছে না ! এরপর এইসব ছাত্ররা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে ভালো ভালো চাকুরি পাবে বলে আমরা সবাই আশা করি ! মূর্খামিরও একটা সীমা থাকা উচিত।

মফস্‌সল কলেজগুলিতে ছাত্র আর শিক্ষকের মান একই ধরনের, তাই যা হওয়ার তাই হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে টেকনিক্যাল শিক্ষার কলেজগুলিতেও একইভাবে সবচেয়ে খারাপ ধরনের ছাত্ররাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তা সত্ত্বেও এই ধরনের কলেজগুলিতে ছাত্ররা কিছু শেখে --- তার কারণ এইসব ছাত্ররা শিক্ষকদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মেধাবী এবং কলেজগুলিতে ইংরাজি মাধ্যমে লেখাপড়া করার নিয়ম থাকার কারণে এবং ইংরাজি ভাষায় বিদেশি লেখকদের অনেক ভালো ভালো বই থাকার কারনে ছাত্ররা নিজেদের ভবিষ্যতের স্বার্থে সেগুলি পড়ে নিজেরাই কিছু শিখে নেওয়ার ব্যবস্থা করে নেয়। তবে ছাত্র রাজনীতির কল্যাণে এই সুযোগটুকুও এখন কড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে গেছে।

গত কয়েক দশক ধরে উচ্চশিক্ষার জন্য, বিশেষত: ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য, দক্ষিণ ভারতের বেসরকারি কলেজগুলিতে এ রাজ্যের সম্পন্ন বাড়ির ছাত্রদের যাওয়ার এক ধুম পড়ে গিয়েছিল। আমাদের রাজ্য থেকে ছাত্ররা বাইরে পড়তে যাবে কেন? সুতরাং সুযোগ সন্ধানী ব্যাবসাদাররা যে যেখানে পারল কিছু 'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' খুলে ফেলল, আর সরকার বাহাদুরও যথারীতি সেগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। কলেজগুলিতে আদৌ কোনো পরিকাঠামো আছে কিনা, উপযুক্ত শিক্ষক আছে কি না — কিছুই না দেখে শুধু আবেদনের ভিত্তিতেই দেওয়া হতে থাকল এরকম স্বীকৃতি। এখন একটু পড়াশোনা করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স

পরীক্ষায় বসলেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। গাদাগাদা টাকার বিনিময়ে ছাত্ররা এইসব বেসরকারি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, ডিগ্রিও একটা পাবে, পাচ্ছেও, কিন্তু শিখছে কতটা? মধ্যবিত্ত অভিভাবক ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে নিজের জীবনের অতৃপ্ত সুপ্ত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি পাওয়ার আশায় সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় শেষ করে, জমিজমা সব বিক্রি করে, বেহিসাবি ঋণ নিয়ে ছেলের চড়া হারের কলেজ ফি মেটাচ্ছেন, একটাই আশা বুকে নিয়ে এত কষ্ট সহ্য করছেন— ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ভালো চাকুরি পাবে, আর সংসারের সব দুঃখ ঘুচবে। শুধুমাত্র ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মতো ছোটো একটি রাজ্যে প্রায় ১৩০০০ আসন আছে — যার জন্য ৩০,০০০ জনের নাম জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্যানেলভুক্ত করা হয়। এছাড়াও ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সমতুল্য A.M.I.E. এবং অন্যান্য কিছু ইঞ্জিনিয়ারিংতেও বেশ কিছু ছাত্র প্রতি বছর ডিগ্রী পান। এর সঙ্গে পলিটেকনিক, আই টি আই ও অন্যান্য সমস্ত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আসন সংখ্যা যোগ করলে মোট সংখ্যাটি ৫০,০০০-এর কাছাকাছি হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করা বেকার তো প্রাইভেট টিউশনি করেও পেটের ভাত যোগাড় করতে পারবে না, আর ডিগ্রি সম্বল কারিগরি জ্ঞানহীন কোনো' ইঞ্জিনিয়ার'কে কোনো প্রাইভেট কোম্পানিও নেবে না। এরা করবেটা কি?

উচ্চশিক্ষায় এবং উচ্চশিক্ষার নামে খরচ হওয়া অর্থের অপচয় খোঁজার কাজে নিযুক্ত 'বিশেষজ্ঞদের' বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অজ্ঞতার শেষ এখানেই নয়, আরও অনেক বিষয় আছে। যেমন ধরা যাক শিক্ষক-শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র — অর্থাৎ বি. এড কলেজগুলির কথা। এই কলেজগুলিতে সাধারণ বিষয় (যেমন দর্শন) পড়ানোর শিক্ষকদের দিয়ে নাকি একই ধরনের বি. এড. এর বিষয় পড়ানো যায় না — সেজন্য পৃথকভাবে গাদা গাদা বি. এড. কলেজ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ সমস্ত বি এড কলেজই সাধারণ কোনো একটি কলেজের সঙ্গে একই জায়গায় থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবার স্কুল শিক্ষকরা একটু লাইন করে সাধারণ একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েই বি. এড শিক্ষক হয়ে গেছেন। এইসব 'প্রফেসর'দের সারাবছর ধরে যে বিপুল পরিমাণ টাকা বেতন দেওয়া হয়, তার পরিবর্তে ওনাদের কতগুলি করে ক্লাস নিতে হয় — শিক্ষাদপ্তর তার খোঁজ রাখে তো? একটা সহজ হিসাব করলে কেমন হয়? সাধারণ কলেজ, বি. এড কলেজ বা ইউনিভারসিটির একজন শিক্ষক সত্যি সত্যি বছরে যতগুলি ক্লাস নেন (৪৫ মিনিটের ক্লাস) তা দিয়ে যদি ওনাদের মোট বার্ষিক বেতনকে ভাগ করা যায়, ক্লাস প্রতি গড় পারিশ্রমিকের পরিমাণের একটি হিসেব পাওয়া যাবে। আমার হিসেবে বি.এড শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ ক্লাস প্রতি ৩০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা ! সরকার বাহাদুর প্রাথমিক-মাধ্যমিক-শিক্ষকদের সম্পর্কে নতুন ধরনের 'মূল্যায়ন' করছেন, বিরূপ জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন — খুব ভালো কথা, কিন্তু এইসব 'প্রফেসর'দের কথা মুখে আনছেন না। কেন? উচ্চশিক্ষার নামে নানাভাবে যে অর্থ অপচয় হয়, তা বাঁচাতে পারলে তা দিয়ে অনেক ছাত্রকেই সত্যিকারের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া যেত, সমস্ত বাচ্চাকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারত। উদ্দেশ্যটি Higher education for all না হয়ে হওয়া উচিত ছিল Education for all, সঠিক

অর্থে। এসব দিকগুলি না চিন্তা করে পুরো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাটিকেই একদল অযোগ্য, রাজনীতির ধাম ধরা ব্যক্তিবর্গের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে পড়াশোনার প্রয়োজন নাই, শুধু লেগে থাকতে পারলে উপযুক্ত জায়গায় তৈলমর্দন করতে পারলে আর উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের আদেশ বিনা প্রশ্নে পালন করতে পারলে 'টেনেটুনে মাধ্যমিক পাস' বুদ্ধির ছাত্রেরও Ph.D ডিগ্রি পাওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা। ইউনিভার্সিটিগুলি এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে Degree Distribution Centre যেখানে গ্র্যাজুয়েশনে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা অন্তত আশি-নব্বই ভাগ পাস করতে না পারলে চারিদিয় হায় হায় রব পড়ে যায়। এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আর তাদের Ph.D ডিগ্রি পাওয়া ছাত্রদের গবেষণার মান নিশ্চয়ই খুব উন্নত। এমনই উন্নত যে সেগুলি আমাদের জ্ঞানগম্যির জগতের অনেক উপর দিয়ে চলে যায় -- এদেশের কথা ছাড়ুন, শোনা যায় বিদেশেও কেউ এগুলি বুঝতে পারেন না, তাই গুরুত্ব না দিয়ে অনেক সময় এগুলিকে বহু পুরানো চর্বিত দ্রব্যের পুনরায় চর্বণ বলে হাসাহাসি করেন, এবং সম্ভবত ডিগ্রিদাতা পরীক্ষককুল ও ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্ররাও বিষয়গুলি ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন কি না, সে ব্যাপারেও নিন্দুকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন।

রোগ সারানোর জন্য রোগের কারণকে সমূলে উৎপাটিত করতে হয়, রোগীর গলা কেটে তাকে মেরে ফেলাটা কোনো চিকিৎসা নয়।

চিকিৎসা-ব্যাবসা

"কোথায় ব্যয়িত হয়—কারা করে ব্যয়;
কী কী দেয়া-থোয়া হয়—কারা কাকে দেয়—"
—জীবনানন্দ দাশ

এক : ভেজাল আর নকল ঔষধ - কার দায় কতটা

আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মধ্যে থাকা হাজার অব্যবস্থার প্রত্যক্ষ কিছু ফলাফল নিউজ চ্যানেলের খবরে ও সংবাদপত্রে প্রতিদিন দেখা যায়। আসল হিমশৈলের চুঁড়াটুকুর খবরও এভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে না, তবু যেটুকু খবর জানা যায়— তার প্রভাবকে ধামাচাপা দেওয়ার নানান ফিকির বের করতেই কর্তৃপক্ষ হিমশিম খেয়ে যান। এখন নানান ধরনের স্বাস্থ্য প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা বিদেশি ঋণ নিয়ে 'কাজ করার' পর্ব চলছে, আগামী কয়েক বছর এভাবেই চলবে। তারপর শুরু হবে এইসব বৈদেশিক ঋণ শোধ করার পালা। তবে ঋণের টাকায় মহোৎসব চলাকালীন ঋণশোধের কথা টেনে নিয়ে এসে হজমে গোলমাল বাধানো এ কলমের উদ্দেশ্য নয়। আপাতত কিছু বিস্মৃত আর অনালোকিত বিষয় নিয়ে চর্চা শুরু করা যাক।

বছর কয়েক আগে মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালের কেনা ঔষধ নিয়ে সামান্য হইচই হয়েছিল, যদিও নানান খবরের ভিড়ে মিশে যাওয়ায় তখনও খবরটি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি, আর এখন ব্যাপারটা তো বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। কি কারনে যেন সরকারি হাসপাতালের ঔষধের গুণমান পরীক্ষা করতে গিয়ে তাতে অতি সামান্য পরিমাণ ঔষধ আর বাকি অংশে চক-পাউডারের মতো পদার্থের উপস্থিতি ধরা পড়ে গিয়ে তা ছোটো একটি 'খবর' হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ছত্রাক সাঁতরানো স্যালাইন বোতল, বৈধ ব্যবহারের সময় পেরিয়ে যাওয়া আয়রন ট্যাবলেট ইত্যাদি ব্যবহার করে রোগী অসুস্থ হয়ে পড়লে তা কখনও সখনও 'খবর' হয়। তবে প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল এগুলি দেখিয়ে যতই দর্শকসংখ্যা বাড়াতে পারুক না কেন— কর্তৃপক্ষের মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষমতা এদের নাই। ভেজাল ঔষধ, জাল ঔষধ, নষ্ট ঔষধ (নতুন লেভেলসহ) গুড়-জল ঔষধ (টনিক)— এমন অনেক ব্যাপার আছে— যেগুলির সম্পর্কে সরাসরি প্রমাণ জোগাড় করা কোনো ব্যক্তি বা মিডিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়— কোনো বড়ো গোয়েন্দা সংস্থা চেষ্টা করলে হয়তো কিছু করতে পারেন।

বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম জেনেছিলাম একজন ভুক্তভোগী হয়ে। এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার স্বাভাবিক ভাবে সন্তান প্রসব হওয়ার পরে সামান্য দুটো সেলাই দিতে হয়েছিল। নিয়মিত ড্রেসিং করা ও

ঔষধ খাওয়ানোর সাতদিন পরেও সেলাইয়ের জায়গার কোনো উন্নতি না হয়ে রোগীর ক্রমশ অবনতি হচ্ছিল। রোগীর অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা ছিল না, ব্লাড সুগারও ছিল না। ডাক্তারবাবুর ঔষধ নির্বাচনও সঠিক ছিল— একাধিক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে বুঝলাম। জীবাণু-নাশক যে ঔষধটি খাওয়ানো হচ্ছিল -তা ছিল মুম্বইয়ের এক বিখ্যাত কোম্পানির দামি ঔষধ। কী মনে হল— অন্য একটি পরিচিত দোকান থেকে একদিনের ডোজের একই ঔষধ আবার কিনলাম। আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা— একদিন ওই ঔষধ খাওয়াতেই রোগী ম্যাজিকের মতো সুস্থ হতে শুরু করল। ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো ওই ঔষধ আরও চার-পাঁচ দিন খাইয়েছিলাম— রোগী যদিও তার আগেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। এরপর দীর্ঘদিন বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ-খবর করতে লাগলাম— আর আলিবাবার রত্ন গুহা আবিষ্কারের মতো এক নুতন, বিস্ময়কর জগতের খোঁজ পেলাম।

আমাদের দেশে আমাদের ব্যবহার করার জন্য যেসব ঔষধ বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি বাজারে নিয়ে এসেছে— ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ বা ইঞ্জেকশন হিসাবে— তার মোট সংখ্যা প্রায় দশ হাজার, অথচ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে আজকের দিনে ব্যবহারযোগ্য ঔষধের সংখ্যা তুলনায় খুবই সামান্য -সাতশোর কাছাকাছি। একথা শুনলেই যে প্রশ্ন সবার আগে মনে আসবে, তা হল— মোট ঔষধের সংখ্যা যদি এত কম— তাহলে বাজারে এত বেশি সংখ্যক ঔষধ পাওয়া যায় কীভাবে? আসলে একই ঔষধ বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নামে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। প্রতিটি ঔষধ বাচ্চাদের জন্য, বড়োদের জন্য— এরকম হিসাব করে বিভিন্ন ডোজে ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ, ইঞ্জেকশন তৈরি করে বাজারে আনা হয়। অবশ্য বাজারে নিয়ে আসা সমস্তরকম ঔষধের যে রোগীকে খাওয়ানোর ব্যাপারে ডাক্তারি শাস্ত্রের অনুমোদন আছে— ব্যাপারটি এমন নয়। যেমন, দুই বা ততোধিক ঔষধ একসঙ্গে মিশিয়ে কোনো ঔষধ বানিয়ে তা খাওয়ানোর (আমাশা ও পাতলা পায়খানার জন্য খাওয়ানো নানান ঔষধ, সমস্ত রকমের কাশি-সিরাপ, হজমি সিরাপ, টনিক সিরাপ ইত্যাদি) জন্য ডাক্তারি শাস্ত্রের কোনো অনুমোদন নেই— অথচ নানান ঔষধ কোম্পানির চাপে আমাদের দেশে এরকম সমস্ত ঔষধের উৎপাদন, প্রেসক্রিপশন, বিক্রি ও ব্যবহার চলছেই। এই ধরনের ঔষধগুলি অনেক সময়ই রোগীর লিভার, কিডনি ও অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি করে রোগীর শরীরে নুতন দুরারোগ্য কিছু রোগের জন্ম দেয়।

ঔষধ-ব্যাবসা চালাতে গিয়ে আমাদের দেশের ছোটো-বড় সমস্ত ঔষধ কোম্পানি নিজস্ব পুঁজির একাংশ ব্যবহার করে প্রশিক্ষিত দালাল (রিপ্রেজেনটেটিভ) মারফত ডাক্তারবাবুদের, হাসপাতালের ঔষধ কেনার কর্তাব্যক্তিদের এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে রাজি করিয়ে ঔষধ বিক্রির ব্যবস্থা করেন। এই ধরনের সমস্ত ব্যাবসার চালানোর ক্ষেত্রে সর্বত্র যা হয় — অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানির রেষারেষি, ব্যাবসা চালানো ও বাড়ানোর জন্যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিকে 'ম্যানেজ' করা (আইনি-বেআইনি যে পথেই হোক)— এরকম সব ব্যাপার এক্ষেত্রেও

চলে। ঔষধ উৎপাদন খরচের চেয়ে বিজ্ঞাপন, দালাল মাধ্যমে প্রচার আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ম্যানেজ করার খরচ অনেক সময়ই বেশি হয়ে যায়— তাই এইসব খরচ ও তার উপর যা খুশি পরিমাণ লাভ করা— এই দুইয়ের কারণে ঔষধের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। যদি ঔষধের আসল নামে (Drug Name) সমস্ত কোম্পানিকে ঔষধ বিক্রি করতে বাধ্য করা যেত— তাহলে সমস্ত ধরনের ঔষধের দামই অনেক কমে যেত। এছাড়া যেক্ষেত্রে বিদেশি কোনো ঔষধ কোম্পানির কাছ থেকে কিনে কোনো নতুন ঔষধ আমাদের দেশের কোনো ঔষধ কোম্পানি বাজারে বিক্রি করে— তখন তারা যা খুশি তাই দাম লাগায় এসব ঔষধের— আর সুযোগ পেলেই 'ম্যানেজ' হওয়া ডাক্তারবাবুরা এই ধরনের ঔষধ প্রেসক্রিপশন করতে উৎসাহী থাকেন।

বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত চিকিৎসাকেন্দ্র সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টেন্ডার ডেকে 'সবচেয়ে কম' দাম দিয়ে ঔষধ কিনতে চায়। নানান ভুঁইফোঁড় কোম্পানি তৈরি হয়ে আছে শুধুমাত্র এইসব সরকারি টেন্ডার ধরার জন্য। এসব কোম্পানি সাধারণতঃ খোলা বাজারে ঔষধ বিক্রি করে না, তাই এদের বিজ্ঞাপন খরচ নেই ; অনেক সময় এদের ঔষধ উৎপাদন বা ঔষধের উপকরণ কেনারও কোন খরচ থাকে না (চক-পাউডার, আটা, বার্লি, গুড়, স্যাকারিন কেমিকেল রং ও গন্ধদ্রব্য কেনার খরচ অবশ্য থাকে)। সেজন্য টেন্ডারে এরা যা খুশি রেট দিতে পারে। টেন্ডার পেলে এরা পুরোপুরি ঔষধহীন 'ঔষধ' অথবা সামান্য পরিমাণে ঔষধ ও বাকিটা অন্য কিছু— এইভাবে ঔষধ 'তৈরি' করে সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে তা সরবরাহ করে। অন্যদিকে আবার যেসব কোম্পানি খোলা বাজারে ঔষধ বিক্রি করে— তারাও একসঙ্গে এত টাকার সরকারি বরাত হাতছাড়া করতে চায় না— অথচ সরকারি 'সর্বনিম্ন দামে' সত্যিকারের ঔষধ সরবরাহ করাও সম্ভব নয়— কারণ টেন্ডার পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে খুশি করতে যা খরচ হয়— তার পরিমাণও কম নয়। সেজন্য এইসব কোম্পানিগুলি যখন টেন্ডার ধরে— তখন এরাও শুধুমাত্র সেই টেন্ডার অনুযায়ী সরকারি হাসপাতাল ইত্যাদিতে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে কিছু ঔষধ তৈরি করে, যেগুলির গুণমান ভুঁইফোঁড় কোম্পানিগুলির মতো প্রায় একই রকম। কাজেই হাসপাতালে মানুষের ভাগ্যে কীরকম ঔষধ জোটে— তা সহজবোধ্য।

খোলাবাজারে যে সব ঔষধ পাওয়া যায়— তার একটা বড়ো অংশ বাজারে আনে এমন কিছু কোম্পানি— যাদের দেওয়া কাল্পনিক কারখানার ঠিকানা যে-কোনো জায়গার হতে পারে— তবে আসল 'কারখানা' থাকে কোনো ছোটো শহরের কোনো এক কানাগলির মধ্যেকার কোনো এক পুরানো বাড়ির একতলায়। এইসব 'কারখানায়' নানান লিভার টনিক, ভিটামিন টনিক, আয়রন টনিক, ক্যালশিয়াম টনিক ইত্যাদির উৎপাদন, বোতলিকরণ, লেভেলিং, প্যাকেজিং— সব কাজ একসঙ্গে করা হয়। এরা সবাই আইনের ফাক গলে ব্যাবসা করে, তাই সাধারণতঃ 'টনিক' ছাড়া অন্য কিছু উৎপাদন করে না। এগুলিকে বোতলবাহিনী কোম্পানি বলা যেতে পারে— কারণ একই ফর্মুলার ঔষধ— অর্থাৎ গুড় ও জলের মিশ্রণ— নানান

সাইজের বোতলে ভরে নানান রকমের লেবেল লাগিয়ে নানান রকমের রং আর গন্ধ মিশিয়ে এরা বিক্রী করে। বেকার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের উন্নতির লোভ দেখিয়ে মাসিক ছয়-সাতশ টাকা 'বেতন' দিয়ে, ঔষধ দোকানদারদের বিক্রীত ঔষধের উপর, ঔষধের দামের (বোতল প্রতি ৬০-৭০ টাকা!) অর্ধেক বা তারও বেশি কমিশনের লাভ দেখিয়ে ও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মোটা অর্থের অলিখিত আর্থিক চুক্তি করার মাধ্যমে এরা ব্যাবসা করে।

যেসব বড়ো বড়ো ঔষধ কোম্পানি আমাদের দেশে ঔষধের ব্যাবসা করে— তাদের কোম্পানির প্রধান অফিস ও কারখানা সাধারণত: থাকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের কিছু শহরে অথবা দক্ষিণ ভারতের কিছু শহরে। বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য নানান ব্যবসায়িক পদ্ধতি ব্যবহার করে এইসব কোম্পানীগুলি নিজেদের ঔষধের নাম বাজারে প্রচার করে — যাতে এই নামগুলি ডাক্তার ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ মানুষও জানতে পারে। এইসব কোম্পানিগুলির ঔষধ আমাদের রাজ্যের খোলা বাজারে যা পাওয়া যায়— তার কত অংশ আসল ঔষধ, আর কতটাই বা জাল— তা বোঝা মুশকিল। এ রাজ্যের জাল ঔষধের ব্যবসা এমনই ব্যাপক আর তার জাল এতটাই বিস্তৃত যে, উপযুক্ত চ্যানেল মাধ্যমে গিয়ে ঠিক জায়গায় 'অর্ডার' দিলে দু-তিনদিনের মধ্যে যে-কোনো কোম্পানির আসল লট নাম্বার-ব্যাচ নাম্বারসহ যে-কোনো ধরনের 'ঔষধ' যতখুশী পরিমাণে পাওয়া যায়। টেলি-কমিউনিকেশন ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে, কমপিউটার সহজলভ্য হয়েছে— ভেজাল ঔষধের ডিজাইন থেকে ব্যাচ নাম্বার— সবকিছুই একদম আসলের মতো করতে আজকাল আর খুব একটা সময়ও লাগে না। আটা বা বার্লির ক্যাপসুল; চক পাউডারের সঙ্গে প্রয়োজন মতো রং এবং অন্যান্য কেমিকেল মিশিয়ে তৈরি করা নানান সাইজের ট্যাবলেট ; স্যাকারিন বা গুড়, রেকটিফায়েড স্পিরিট, কেমিকেল রং এবং গন্ধ ইত্যাদি প্রয়োজন মতো মিশিয়ে তৈরি করা নানান তরল ঔষধ বানানো, লেবেল ছাপানো ও লাগানো, প্যাকিং করা— সবই খুব কম সময়ের মধ্যে করার জন্য দারুণ এক সু-শৃঙ্খল ব্যবস্থা আছে। ভেজাল ঔষধের সবচেয়ে বড়ো ব্যাবসাটি হয় আমাদের রাজ্যের রাজধানীতেই— বাগড়ি মার্কেটের একাংশে। নগদ অর্থমূল্য দিতে পারলে আসল দামের শতকরা দশ শতাংশ মূল্যে এখান থেকে যে কেউ 'ঔষধ' গুলি কিনে নিয়ে যেতে পারেন।

প্রশ্ন আসতে পারে— খুচরো ঔষধ দোকানগুলির একাংশ কীভাবে এইসব ভেজাল ঔষধ বেচেন? একে তো সাধারণ মানুষের অভ্যাসই হল ঔষধ কেনার পর কোনো রসিদ-ফসিদের খোঁজ না করে টাকা মিটিয়ে বাড়ি চলে যাওয়া— আর তার উপর খুচরো ঔষধ দোকানগুলি প্রায় সবসময়ই রসিদ দিতে হলে ঔষধের ওপরে লেখা দামের উপরে ট্যাক্স দিতে হবে বলে ভয় দেখায়। মানুষ সেজন্য দু-পয়সা সাশ্রয় করার চেষ্টা করে আর রসিদের খোঁজ নেয় না। ঔষধ দোকানগুলি কি না জেনেই খদ্দেরকে নকল ঔষধ বিক্রি করে? — কখনও কোনোদিনই এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না। একে তো নকল ঔষধের কেনা দাম আসল ঔষধের চেয়ে অনেক কম— দোকানদার দালালদের কাছ থেকে জেনেশুনেই কম দামের নকল ঔষধগুলি

কেনে। অবশ্য চালাক দোকানদাররা একই সঙ্গে একই কোম্পানির একই লট নাম্বারের কিছু আসল ঔষধও কিনে রাখে— দু-একটি ক্ষেত্রে ঔষধ বিক্রি করার পর রসিদ দিতে হয় তো! এরপর নকল ঔষধ আর আসল ঔষধ-কোনোটি কোনো খদ্দেরকে বিক্রি করতে হবে— তা খদ্দের দেখে-বুঝে ঠিক করা হয়। জমি বা স্ত্রীর ছিটেফোঁটা গহনাটুকু বন্ধক রেখে টাকা ধার করে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে রোগী নিয়ে আসা গ্রাম্য লোকজনদের বিক্রি করার সময় অবশ্য শহুরে দোকানদারদের হাত নকল ঔষধের বাক্সেই পড়ে— মাথায় হাত বোলালে এসব মানুষের বোঝার বা বুঝলেও ঝামেলা পাকানোর কোনো ক্ষমতা নেই যে!

এটুকু পড়ে নিয়ে কোনো মানুষ যদি এ নিয়ে খোঁজ-খবর করতে বেরিয়ে পড়েন— তাহলে তার ভাগ্যে দুঃখ আছে। যে ব্যাপারগুলি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হল— তা আমাদের রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবসা এবং ঔষধ ব্যাবসার সঙ্গে সম্পর্কিত অধিকাংশ মানুষই জানেন। এরকম 'অভিজ্ঞ' মানুষের সংখ্যা অন্তত: কয়েক হাজার হবে, অথচ যাদের এই বিষয়গুলি জানা দরকার, তারা কিন্তু এসব জানেন না! আমাদের রাজ্যের হাসপাতালগুলির জন্য— সে মানুষের হাসপাতালই হোক বা জীবজন্তুর ভেটেরিনারি হাসপাতালই হোক— সরকার বাহাদুর প্রতিবছর কয়েকশো কোটি টাকার ঔষুধ কেনেন গরিব মানুষের উপকারে লাগবে বলে। এই ঔষধ কেনা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নিয়ে নয়, শুধু কয়েকটি ছোটো বিষয় নিয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে কেমন হয়? যেসব কোম্পানির ঔষধ কেনা হয়— সেসব কোম্পানির নাম সংশ্লিষ্ট দপ্তরের approved list-তে ঢোকানো হয় কোনো ভিত্তিতে? যারা খোলা বাজারে ঔষধ বিক্রি করে না, তারা টেন্ডার ধরার অধিকার পায় কোনো যুক্তিতে? দরপত্রে এসব কোম্পানি তাদের ঔষধ উৎপাদন কারখানার যে ঠিকানা দেয়—সেখানে আদৌ কোনো কারখানা আছে কিনা— তা সরোজমিনে তদন্ত করে দেখা হয় কি? ঔষধ কোম্পানিগুলির সরবরাহ করা ঔষধের স্যাম্পেল পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে কি? কারা তা করে ? বাগড়ি মার্কেটে দিন-দুপুরে নকল ঔষধ বিক্রি হয় -- কেউ কেন কিছু জানে না ?

না— প্রশ্ন করা যায় অনেক— তবে তাতে শুধু ঔষধ ব্যবসায়ী নন, পদস্থ কর্তাব্যক্তি থেকে রাজনৈতিক নেতা— অনেকেরই ক্ষেপে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দুই : ডাক্তারই যখন রোগের বাহক

আলোচনার প্রথমেই বলে রাখা ভালো- এই প্রবন্ধের আলোচিত বিষয়গুলি হয়তো ডাক্তারবাবুরা সবাই বুঝবেন এবং সম্ভবত: অধিকাংশ ডাক্তারবাবুই অপরাধীদের অপরাধের গুরুত্বও বুঝতে পারবেন, কিন্তু বৃত্তিগত কারণে ওনাদের কাউকেই একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ওনাদের মধ্যেই রে রে করে তেড়ে আসার লোকও অনেক আছেন— জানি না তাঁদের আত্মসংযম তাঁদের আটকে রাখতে পারবে কিনা।

তবুও বিষয়গুলি যেহেতু আমার মতো আরও কোটি কোটি মানুষের জীবন-মরণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বিষয়গুলির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না, সেজন্য ডাক্তারবাবুদের কাছে জীবন বন্ধক রেখে ভয়ে ভয়ে দু-চার কথা বলছি। তবে এ-প্রসঙ্গে হাতুড়ে ডাক্তারদের কথা আর তুলছি না; ডিগ্রিপ্রাপ্ত, রেজিস্ট্রিকৃত ডাক্তারবাবুদের নিয়ে করা আলোচনা থেকেই ওনাদের সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়ে যাবে, আশাকরি।

প্রথমেই দাঁতের ডাক্তারবাবুদের কথায় আসি। চিনা ডেনটিস্ট্দের দিন বহুদিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আর দশ -বিশ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দাঁতে ফাঁস লাগিয়ে নষ্ট দাঁত উপড়ে ফেলা চলে না— এ কাজের জন্য সামনে-পেছনে-উপরে-নীচে নামানো-ওঠানো-ঘোরানোর চেয়ার, তৎসহ বিকট আকৃতির আলোযন্ত্র, জল ছোঁড়া মেশিন, হাওয়া ছোঁড়া মেশিন, দাঁত খোদাই করা মেশিন ইত্যাদি নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়। এত সহায়ক মেশিন থাকলেও দন্ত-চিকিৎসার আসল ব্যাপারটি একই থেকে গেছে— দাঁতের মধ্যে ক্ষত হয়ে যন্ত্রণা হলে এক্স-রে করে দেখে নিয়ে দাঁতটি তুলে ফেলা, প্ল্যাসটার অফ প্যারিসের ছাঁচ তৈরি করে সেই অনুযায়ী নকল দাঁত বাঁধানো ও লাগানো এবং প্রয়োজোনে দাঁতের ফুটো সিল করা। এছাড়া 'সৌন্দর্যবৃদ্ধির' চেষ্টায় অনেক সময় দাঁতের ধার ছোলা বা দাঁতের টানাটানি— বাঁধাবাঁধিরও কিছু ব্যবস্থা মাঝেমধ্যে নিতে হয়। দাঁতের ডাক্তারবাবুদের দাঁত সিল করার ভালো উপকরণগুলি সবই বিদেশি। এগুলি ছাড়া পটাশিয়াম নাইট্রেট ও ফ্লোরাইডযুক্ত মাজন, কিছু স্থানীয় চেতনানাশক ঔষধ আর টেট্রাসাইক্লিন-টিনিডাজোলের মতো কিছু জীবাণু-নাশক ঔষধের, ব্যবহার-বিধি জানা থাকলেই দাঁতের ডাক্তারবাবুদের কাজ চলে যায়। অবশ্য অধিকাংশ এক্স-রে সেন্টারে দাঁতের এক্স-রে পরীক্ষা করার সময় উপযুক্ত মেশিনের বদলে সাধারণ মেশিনে এই পরীক্ষা করার কারণে মারাত্মক এক্স-রে (রশ্মি) অনেক সময়ই রোগীর চোখের ও মাথার মধ্য দিয়েই চলে যায়— যা রোগীর পক্ষে টের পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এভাবে যদি মাঝেমধ্যেই চলে তাহলে রোগীর চোখের ও মস্তিষ্কের কোষোগুলির মারাত্মক ক্ষতি হয়, যা থেকে রোগীর অন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে মৃত্যু হওয়া— সবকিছুই হতে পারে। তবে এসব ব্যাপার নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যাথা নেই— আর সে আলোচনাতেও এখন যাচ্ছি না।

দাঁতের ডাক্তারবাবুদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। মানুষ কোনো কাজে দু'ভাবে ভুল করতে পারে—কোনো বিষয় না জানা থাকলে— অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব থাকলে— অথবা সবকিছু জেনে-বুঝেও আলসেমির কারণে অথবা অন্যের ক্ষতিতে আমার কি— এই মানসিকতা থাকলে। প্রতিটি দন্ত রোগীর দাঁত দেখার জন্য ডাক্তারবাবুরা যে

অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ছোট্ট স্কেলের আকৃতির পাতটি দিয়ে রোগীর জিবটি চেপে ধরেন, অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার— এ পাত ডাক্তারবাবুদের একটি বা কারও কারও দুটি মাত্র থাকে। সারাদিন গাদা গাদা রোগীর জিব ওই একই পাত দিয়ে চেপে ধরা হচ্ছে, মাঝেমধ্যে অবশ্য ট্যাপের জলের মধ্যে একটু ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে পাতগুলি। একই ঘটনা ঘটে দাঁত খুঁচিয়ে নোংরা বের করার বাঁকানো ছুঁচ বসানো যন্ত্র এবং দাঁত তোলার বিভিন্ন রকমের সাঁড়াশি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলি সম্পর্কেও। শুধু ট্যাপের জলে একটু নেড়ে নিলেই (ঘসে ধোওয়াও নয়!) এগুলি জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়? একবার এক ডাক্তারবাবুকে এ নিয়ে প্রশ্ন করায় উত্তর পেলাম— "আমরা মাঝে মাঝে যন্ত্রপাতিগুলো জলে ফুটিয়ে নিই তো"। যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে কতক্ষণ ফোটাতে হয় জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তারবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

চিনা ডেনটিস্টের' তুলনায় ডাক্তারবাবুদের ফি বিশ-ত্রিশ গুণ, অথচ পরিচ্ছন্নতা পঞ্চাশগুণ খারাপ। এইড্সসহ নানান মারাত্মক রোগের সংক্রমণ এভাবে এক রোগী থেকে আরেক রোগীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ডাক্তারবাবুরা নির্বিকার।

আমাদের রাজ্যে হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিতে প্রতিদিন হাজার হাজার অপারেশন হয়। এক একটি অপারেশনে বেশ কিছু ছুরি, কাঁচি, ফরসেপ ইত্যাদি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। নিয়ম হল— প্রতিটি অপারেশন হওয়ার আগে অপারেশন ঘরে কী কী যন্ত্র, সুচ, তুলো, গজ ইত্যাদি নিয়ে ঢোকা হল তার একটি তালিকা লিখে রাখা। অপারেশন হওয়ার পর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও অব্যবহৃত জিনিসপত্র— দুইয়ের যোগ করে তার হিসাব আগের হিসাবের সঙ্গে মেলাতে হয়। এরপর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে ধুয়ে-মুছে প্যাক করে নিয়ে প্রয়োজনমতো এগুলিকে গরম হাওয়া কলে (Hot air oven), উচ্চ-চাপে সেদ্ধ করা কলে (Autoclave machine) ইত্যাদির মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করতে হয়। অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আবার অতি বেগুনি রশ্মি (Ultraviolet rays) দিয়ে বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে জীবাণুমুক্ত করতে হয়। সেজন্য প্রতিটি নাসিংহোম বা হাসপাতালে বেশ কয়েক সেট অপারেশনের যন্ত্রপাতি রাখা প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যে নাসিংহোমগুলিতে কত সেট কর্মক্ষম যন্ত্রপাতি আছে এবং সেগুলিকে জীবাণুমুক্ত করার চালু মেশিন আছে কিনা তা খোঁজ নেওয়ার পর নার্সিংহোমগুলির রেজিস্ট্রেশন করা হয় তো? আবার হাসপাতাল ও কিছু কিছু নার্সিংহোমে দু-একটি এরকম মেশিন থাকলেও সেগুলি নিয়মিত সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় তো? বাস্তব অবস্থার খোঁজ নিলে চমকে উঠতে হয়— যদিও সেকথা লিখলে আসামি হয়ে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

অপারেশনের সময়কার রোগীর রক্ত, পচা বা বাদ দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ব্যবহৃত স্যালাইন

সেট ও ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ— এগুলি সঠিক ভাবে নষ্ট করা না হলে যে কোন সময় মানুষের মধ্যে রোগের মহামারি শুরু হয়ে যেতে পারে। এগুলি নষ্ট করার জন্যও আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার। বাস্তবে কি দেখা যায়? অধিকাংশ নার্সিংহোম এবং প্যাথলজিক্যাল ক্লিনিকের সমস্ত আবর্জনা রাস্তার ধারে অন্যান্য জঞ্জালের মধ্যে ফেলা হয়— আর হাসপাতালগুলির বর্জ্য নিয়ে কিছু না আলোচনা করাই ভালো। বছর দুই আগে মালদহ শহরে এক হাসপাতালের বর্জ্য ফেলা গাড়ি থেকেই ব্যবহৃত ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ নামানোর সময় এক প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল হাতে নাতে ছবি তুলে নিয়েছিল। এরকম ঘটনা প্রতিদিন সারা রাজ্যের সর্বত্রই ঘটে চলে, তবে ধরা পড়ে না, এই যা। এইসব ব্যবহৃত সিরিঞ্জ জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে আবার প্যাক হয়ে 'জীবাণুমক্ত ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ' হয়ে বাজারে চলে আসছে আর আমাদের অজান্তে আমাদের মধ্যে নানান রোগ ছড়িয়ে দিচ্ছে। অতীতের কাচের ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ ও স্টিলের নিডল— যা মিনিট দশেক জলে ফুটিয়ে ব্যবহার করা হত— তা কি এর চেয়েও খারাপ ছিল ?

এবার স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের কথা একটু আলোচনা করা যাক। যে-কোনো স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু সারাদিনে অন্তত: একশোজন রোগী দেখেন, কেউ কেউ অবশ্য এর পাঁচগুণ রোগীও দেখেন। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের প্রায় প্রতিটি রোগিনীর যোনিদ্বার পরীক্ষা করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওনারা আগে ব্যবহার করা ল্যাটেক্সের গ্লাভসগুলি ধুয়ে চক্ পাউডারে শুকনো করে নিয়ে আবার হাতে পরেন। জানি— একথা কেউ স্বীকার করবেন না— তবে দেখা রোগীর সংখ্যা ও গ্লাভস কেনার হিসাব— দুটো মেলাতে গেলে কিন্তু সবাই ধরা পড়ে যাবেন। ধুলেই গ্লাভস জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়? গ্লাভসগুলিকে সত্যি সত্যি জীবাণুমুক্ত করতে যে ব্যবস্থা লাগে— তা কতজন ডাক্তারবাবুর আছে? এখানেই শেষ নয়— সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারটি এখনও আলোচনা করাই হয়নি। ডাক্তারবাবুরা রোগিনীর যোনির ভেতরের অংশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য যে Vaginal Speculum যন্ত্র ব্যবহার করেন, তা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের কয়টি আছে? একটি— হয়তো বা কারও কারও দুটি। এক রোগিনীর যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করার পরে অন্য রোগিনীর যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করার আগে বড়োজোর সেই ট্যাপের জলে একটু নেড়ে নেওয়া! মাননীয় ডাক্তারবাবু— এভাবে কী সিফিলিস, গানোরিয়া, হার্পিস, হেপাটাইটিস থেকে কালান্তকএইড্স— এসব রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়? আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন?

ডাক্তারবাবুদের বক্তব্য— ওনাদের অ্যাসিস্‌টেন্টরা নাকি গরমজলে সব ফুটিয়ে দেন। এক রোগী দেখা শেষ হওয়ার কতক্ষণ পর অন্য রোগী দেখা শুরু করেন, ডাক্তারবাবু? গরমজলে যতক্ষণ ফোটালে যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত হয়— দুটি কেস দেখার মধ্যে ততক্ষণ ফাঁক

থাকে তো? আপনাদের এক চিলতে ঘরের পর্দা দিয়ে ভাগ করা দুটো অংশের কোনোখানে এইসব ফোটানো-টোটানো হয়, দয়া করে বলবেন কি? অটোক্লেভ মেশিন না থাক, একটা প্রেসার কুকার আর একটা কেরোসিন স্টোভ কেনার টাকাও কি আপনাদের নেই? নাকি রোগীরা শুধুই টাকা উৎপাদনের মেশিন— তাদের বাঁচা-মরা আপনাদের কাছে গুরুত্বহীন— কোন্‌টা ঠিক, ডাক্তারবাবু?

তিন: দায়বদ্ধ চিকিৎসক অথবা সোনার পাথরবাটি

অগ্নীশ্বর মুখুজ্জেকে মনে আছে? বনফুলের এক অমর সৃষ্টি। উপন্যাসটি সিনেমা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত অগ্নীশ্বররূপী উত্তম কুমারের অভিনয় দেখে চিরকালই সবাই মোহিত হন। বাস্তবে এমন কতোজন দম্পতি আছেন, যারা নিজের সন্তানকে ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন দেখেন— আর একজন অগ্নীশ্বর মুখুজ্জের মতো ডাক্তার? কিংবা কতোজন হবু ডাক্তারের মা-বাবা নিজেদের সন্তানদের ছাত্রজীবনে একজন অগ্নীশ্বর হওয়ার জন্য উদবুদ্ধ করেন? সত্যিকারের পরিসংখ্যান পাওয়া গেলে মনে হয় না সংখ্যাটি খুব বড়ো একটা কিছু হবে। প্রায় সব বাবা-মাই স্বপ্ন দেখেন ডাক্তার হয়ে তাদের সন্তান অনেক টাকা রোজগার করবে। এই একই চিন্তা মাথায় নিয়েই একজন হবু ডাক্তার ডাক্তারি কলেজে ভরতি হন। এর উপরে আছে আজকের 'সামাজিক মরালিটি'— যা শুধু মানুষকে ভোগের উপকরণ জোগাড় করতেই উদবুদ্ধ করে। এই অবস্থায় একজন সদ্য-স্নাতক চিকিৎসক শুধু 'Oath' পড়েই নিজের সারাজীবন মানুষের কল্যাণে সমর্পণ করবেন— এতটা আশা করা কখনোই উচিত নয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যা হয়— একজন উকিল, একজন ব্যবসায়ী, একজন চাকুরীজীবি— যাদের কাজকর্মের বিচার করা হয় কেবলমাত্র তাদের কাজকর্মেরই বিচার করে— ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একইরকম হওয়া উচিত। Noble Profession— বলতে-শুনতে মনের মধ্যে বেশ একটা পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়— ডাক্তারি ব্যাপারটি এরকম পবিত্র নেই আর।

আমাদের রাজ্যে দু-ধরনের ডাক্তারবাবুকে আমরা দেখতে পাই— একদল হাসপাতাল-নার্সিংহোমে চাকুরি করেন এবং প্রাইভেট প্রাকটিসও করেন— আর অন্যদল শুধুই প্রাইভেট প্রাকটিস করেন। মনে প্রশ্ন জাগে— সরকারি হাসপাতালে চাকুরি করা ডাক্তারবাবুরা কি সরকারি কর্মচারী নন? সরকারি কর্মচারীদের সার্ভিস রুলে আছে যে সমস্ত সরকারি চাকুরি হল Whole time job, সেজন্য চাকুরি-রত অবস্থায় (ডিউটির সময়কালীন তো বটেই) অন্য কোনো অর্থ উপার্জনের কাজ করা যায় না। অথচ যেসব ডাক্তারবাবুরা সরকারি হাসপাতালে চাকুরি করেন, তারা আউটডোরে প্রতি মিনিটে ১০ -১৫টি করে রোগী দেখেন বা হাসপাতালে ভরতি হওয়া রোগী ভিজিট করা মানে শুধু সারি সারি বিছানার মাঝখানের গলিপথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া বোঝেন অথবা অপারেশনের সময় কাটাকুটি শেষ হলেই নার্সের হাতে সেলাই-টেলাই করার দায় চাপিয়ে বেরিয়ে আসেন আর গাইনো হলে নার্সের হাতে

ডেলিভারির সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে চলে যান— বাকি সময়টা এনারা সবাই ব্যস্ত থাকেন প্রাইভেট প্রাকটিসে।

কোনোকিছু ভাবতেই আমাদের আজকাল আর কাররই অবাক লাগে না, সবকিছুই আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিই, তবু একবারও কি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না যে সরকারি চাকুরে এইসব ডাক্তারবাবুরা ডিউটির সময় হাসপাতালে না থেকে নার্সিং-হোমে, ঔষধ দোকান সংলগ্ন চেম্বারে, এমনকি সরকারি কোয়ার্টারে বসে রীতিমতো সাইনবোর্ডে ও প্রেসক্রিপশনে রোগী দেখার সময় উল্লেখ করে প্রাকটিস করে চলেছেন, কেউ কেউ আবার এসব করছেন কর্মস্থল থেকে বহুদূরের কোনো জায়গায়— অথচ গ্রেফতার হচ্ছেন না! এদেশেই কেবলমাত্র এরকম হওয়া সম্ভব।

যেসব ডাক্তারবাবুরা সরকারি চাকুরি করেন না, শুধুমাত্র প্রাকটিস করেন, তাদের উপর সামান্যতম চাপও থাকে না— তাই রোগী ধরার বা রোজগার বাড়ানোর জন্য যে-কোনো ধরনের পন্থা অবলম্বন করার পথে ওনাদের কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও থাকে না। সরকারি অ-সরকারি সব ধরনের ডাক্তারবাবুদের একট বড়ো অংশ রোগী ধরার জন্য নানা ধরনের দালাল পুষে রাখেন— কমিশনের ভিত্তিতে। বড়ো বড়ো সরকারি হাসপাতালের সামনে মুরগি ধরতে পটু যেসব 'সাহায্যকারী'রা অপেক্ষা করে থাকেন— তারা যেমন হাসপাতালমুখী রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বুঝিয়ে কোনো ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বা নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়ে কমিশন খান, তেমনি আবার তেমন তেমন মুরগি পেলে কোনো কানাগুলির মধ্যে ঢুকিয়ে রোগীর বা রোগীর লোকজনদের কাছে থাকা সমস্ত টাকা-পয়সা কেড়েও নেন। এছাড়া আর এক ধরনের দালাল আছে, যারা আসলে অ্যাম্বুলেন্স চালক বা রিকশাওলা— তারাও বাসস্ট্যান্ড বা রেলস্টেশনের মতো জায়গাগুলিতে উপযুক্ত মুরগি পেলে সেইসব রোগী ও রোগীর সঙ্গীদের কানে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবুর বা প্রাকটিশ করা ডাক্তারবাবুর এমন সব গুণাবলির কীর্তন করতে করতে বাহনে চাপিয়ে নিয়ে চলেন, যা শুনলে স্বয়ং ধন্বন্তরীও কানে হাত চাপা দিতেন। গ্রাম্য এবং অশিক্ষিত শহুরে রোগীরা আসল ব্যাপার কিছুই বোঝে না— তাই অপারেশনের কেসেও মেডিসিনের ডাক্তারবাবুকে ফিসটা দিয়ে আসেন, প্রেসক্রিপশনে হাবিজাবি ঔষধের নামও কোনো সার্জেনের রেফারেন্সটুকু লিখিয়ে নিয়ে। এরকম আরও কিছু ফাঁদের মধ্যে পড়ে এক বড়ো পরিমাণ অর্থ গচ্চা দেওয়াই হয় এরকম রোগীদের ভবিতব্য। এছাড়াও এরপর এসব রোগীকে আরও নানান ধরনের হ্যাপা সামলাতে হয়— সেগুলি নিয়ে আলোচনার শেষ করা যাবে না।

শুধুমাত্র প্রাকটিস করেন— এমন ডাক্তারবাবুদের একাংশ আবার ওনাকে দেখাতে আসা সমস্ত রোগীকে 'রক্ত পরীক্ষা' করতে উপদেশ দেন। সে পরীক্ষা ডাক্তারবাবু নিজেই করেন— তাই আলাদা করে কোনো রিপোর্ট দেওয়ারও কোনো ব্যাপার নেই। রক্তের কী কী পরীক্ষা

ওনারা প্রাকটিসের ফাঁকে ফাঁকে কোনো ল্যাবরেটরি ছাড়া ও কোনো সাহায্যকারী ছাড়াই করেন, তা ওনারাই জানেন, তবে পঞ্চাশ টাকা ভিজিট করে রেখে রোগী 'ধরে' তার উপর দেড়-দুশ টাকা 'রক্ত পরীক্ষার' চার্জ নেন ওনারা। ডাক্তারবাবু নিজে রক্তের মতো মারাত্মক জিনিস পরীক্ষা করে দেখবেন— তার জন্য মাত্র দেড়শ টাকা চার্জ দিতে সবাই রাজি ! এরকম শুধুমাত্র প্রাকটিস করা ডাক্তারবাবুদের একাংশ আবার কিছু সার্টিফিকেট (পড়ুন না পড়া কাগজ) সই করেও মাসে বেশ মোটা টাকা রোজগার করেন। না— জীবনবিমার হেল্‌থ সার্টিফিকেট সইয়ের ব্যাপার নয়— প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট বা এক্স-রে পরীক্ষার রিপোর্ট সই করা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এইসব রিপোর্টে যেসব ডাক্তারবাবুর সই থাকে— তাকে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা বা এক্স-রে করতে আসা রোগীরা কোনোদিনই চোখে দেখতে পান না। আমাদের দেশে এক্স-রে ইউনিট দেখা যায় যত্রতত্র— আর অতি সাধারণ শারীরিক অসুস্থতাতেও এক্স-রে করার এক চল মফস্‌সলে এসে গেছে ডাক্তারবাবুদের অর্থলোলুপতার কারণে। এক্স-রে খুবই মারাত্মক জিনিস, খুব সাবধানে এর ব্যবহার করতে হয়। সঠিক ভাবে এক্স-রে ইউনিটের ব্যবহার জানা টেকনিশিয়ান নেই প্রায় কোনো ইউনিটেই। যন্ত্র চালকের সামান্য ভুলে বা অজ্ঞানতার কারণে প্রয়োজনের বেশি ডোজে বা বেশি সময় ধরে এক্স-রে হয়ে গেলে রোগীর কিছুদিনের মধ্যেই ক্যানসার হতে পারে। এছাড়া বেহিসাবি ভাবে যখন-তখন এক্স-রে করলেও একজন মানুষের ক্যানসার হতে পারে। প্রতিটি এক্স-রে ইউনিটের ঘরের সারা দেওয়াল কয়েক ইঞ্চি মোটা সিসার পাত দিয়ে ঢেকে রাখাই নিয়ম— কারণ তা না হলে এক্স-রে দেওয়াল ভেদ করে পথ চলতি মানুষ বা আশেপাশে বসবাস করা মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। সাধারণ মানুষ কোনো ছার— দেখে দেখে শেখা যেসব 'টেকনিশিয়ান' এসব মেশিনগুলি চালান—তারাও জানেন না যে দু-চারটা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে এই রশ্মি অনায়াসে চলে যেতে পারে। এসব টেকনিশিয়ানরা সিসার পাত দিয়ে তৈরি করা জামাটুকুও পরেন না এক্স-রে নিয়ে কাজ করার সময় ! এছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। কোনো রোগীর শরীরের কোনো একটি বিশেষ অঙ্গ এক্স-রে করতে গেলে পাশের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলি সিসার পাতের পোশাক দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। এই নিয়ম না মানলে শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যানসার হওয়া ছাড়াও চোখ, কিডনি, মস্তিষ্ক বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ডাক্তারবাবুরা ছাত্রজীবনে পরীক্ষা পাস করার জন্য এ সমস্ত নিয়মকানুন সবই পড়েছেন, তাই সবই জানেন— অথচ এরকম সব এক্স-রে ইউনিটের সঙ্গে 'যুক্ত থেকে' শুধু ছবি দেখে সার্টিফিকেট দেওয়া ডাক্তারবাবুরা সব জেনে-বুঝেও অম্লানবদনে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন আর টাকা গুনে নিচ্ছেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে কোথাও ছড়ে-কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিটেনাস ইঞ্জেকশন নেওয়ার জন্য ব্যগ্র হওয়ার একটা হুজুগ কাজ করে। কাছাকাছি কোন হাসপাতালে গিয়ে টিকিট করে অথবা কোনো ঔষধ দোকানে গিয়ে একটা টিটেনাস ইঞ্জেকসন (টিটেনাস টক্স য়েড) নিয়ে নেন সবাই। গভীর ক্ষত না হয়ে শুধু ছড়ে গেলে টিটেনাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই

থাকে না— আর যখন-তখন বেহিসাবি ভাবে এই ইঞ্জেকশন নেওয়া ক্ষতিকারকও হতে পারে। সে প্রসঙ্গ যাক, কিন্তু এই টিটেনাস টক্সয়েড এবং হাসপাতাল ও ঔষধ দোকানে সংরক্ষিত করে রাখা জলাতঙ্কের টীকাসহ সমস্ত রকমের টীকা এবং কিছু কিছু জীবনদায়ী ঔষধ কিন্তু নির্দিষ্ট তাপমাত্রার ঠান্ডা পরিবেশে (সাধারণত: ২ ডিগ্রি থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে) না রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের রাজ্যের হাসপাতাল-নার্সিংহোম বা ঔষধ দোকানগুলির এক অতি সামান্য অংশে ফ্রিজ চালানোর জন্য কোনো জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকে—আর ব্যবস্থা থাকলেও সেই ব্যবস্থা সাধারণত: রাত্রে চালু থাকে না। সরকারি খাতায় যাই লেখা থাক— গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বা ঔষধ দোকানগুলির কথা ছেড়ে দেওয়া যাক— খোদ ব্লক বা মহকুমা স্তরেই বা বিদ্যুৎ সরবরাহ সারাদিনে সত্যি সত্যি কতক্ষণ থাকে? একনাগাড়ে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে কিন্তু ফ্রিজের সমস্ত টিকা বা ঔষধ নষ্ট হয়ে যায়— তাই সেগুলিকে ফেলে দেওয়াই নিয়ম। সারা বছরের বাকি সময়টা যেমন-তেমন চলে যায় কিন্তু গ্রীষ্মকালে আর বর্ষাকালে আমাদের মফস্সলে শহরগুলিতেই মাসে অন্তত সাত-আটদিন একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে না, কাজেই টীকা ও ঔষধগুলি সবই এসময় নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু একবার কলিকাতা থেকে মফস্সলে পৌঁছে গেলে এগুলি কোনো কারণেই কারোর পক্ষে ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। হাসাপাতাল কর্তৃপক্ষ ফেলে দিতে গেলে নানান অফিসিয়াল ঝামেলায় পড়বেন— আর নার্সিংহোম, ঔষধ দোকান (এবং কিছু কিছু শিশুচিকিৎসক ডাক্তারবাবুর চেম্বারেও) এসব ফেলবে না— আর্থিক লোকসানের ভয়ে। গ্রাম গরিব মানুষরাই সাধারণত: এসব টীকা বা ঔষধ ব্যবহার করেন, আর ভাবেন নির্দিষ্ট রোগগুলির জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরে তৈরি হয়ে গেছে— অথচ ভবিষ্যতে এইসব রোগে ভোগার সম্ভাবনা ওনাদের পুরোটাই থেকে যায়। অন্যদিকে এসব টীকা বা ঔষধগুলির নষ্ট হয়ে যাওয়া উপকরণগুলি শরীরে ঢুকলে তা থেকে অন্য অনেক অজানা বিপত্তির শরীরে বাসা বাঁধার সম্ভাবনা তৈরি হয়। সরকার বাহাদুরের প্রতিবছর প্রতিষেধক টিকা কেনা খাতে যে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হয়— শুধুমাত্র cold chain বজায় রাখার সামর্থের অভাবে তার অধিকাংশটাই জলে চলে যায়— কোন কাজে লাগে না।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যাপারটির প্রায় পুরোটাই ঔষধ কোম্পানিগুলির নির্দেশে চলে। ঔষধ কোম্পানিগুলি নিজেদের প্রশিক্ষিত দালালদের (Sales Representative, যাদের কাররই চিকিৎসা-বিদ্যা সংক্রান্ত কোনো শিক্ষা সাধারণত থাকে না) নিজেদের ঔষধ সম্পর্কে যা যা ট্রেনিং দেয়, তাঁরা ডাক্তারবাবুদের কাছে গিয়ে ঔষধের গুণাগুণ, ডোজ— এসব সম্পর্কে সেই কথাগুলিই বলেন। স্বভাবতই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য সব কোম্পানিই নিজেদের ঔষধগুলি সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করবেই— আর একই কারণে একে অপরকে টপকে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে এইসব অতিশয়োক্তিগুলি অনেক সময়ই প্রায় মিথ্যের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। নুতন ধরনের জীবাণু-নাশক ঔষধগুলির (Antibiotics)

ক্ষেত্রে এরকম প্রায়শই হতে দেখা যায়। আজকাল নীতিকথাগুলোকে বইয়ের মধ্যে বন্দি রেখে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঔষধ বিক্রি করার টোপ হিসাবে ডাক্তারবাবুদের ফ্রিজ-টি.ভি. নয়— নতুন বিদেশি গাড়ি থেকে প্রয়োজনে সঙ্গিনীসহ বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা পর্যন্ত সবকিছুই করতে রাজি ঔষধ কোম্পানিগুলি!

আমাদের দেশের সরকারি চাকুরিরত নামী - অনামি ডাক্তারবাবুরা যতই দামি হোন না কেন— চেম্বারে ওনাদের সব সময়ই ভিড় লেগে থাকে। এইসব ডাক্তারবাবুদের অনেককে আবার চেম্বারে রোগী দেখা চলাকালীনই রোগীদের বসিয়ে রেখে ঘন্টাখানেক সময় বের করে একবার হাসপাতালের খাতায় সই করতে যেতে হয় (চাকুরি আছে না!)। সেজন্য এনারা সবসময়ই চেষ্টা করেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিটি রোগীকে 'ছাড়তে'— যাতে আরও বেশি রোগী দেখা যায়। ডাক্তারবাবুদের কাছে তাই সময় = রোগী দেখা = অর্থ উপার্জন। এইসব ডাক্তারবাবুদের কোনো সময় বা ইচ্ছেই নেই বাজারে আসা নতুন ঔষধগুলি (যেগুলি ওনাদের ডাক্তারি পড়ার সময় আবিষ্কৃত হয়নি) সম্পর্কে সামান্যতম পড়াশোনা করার। সেজন্য ওনাদের নতুন কিছু জানার একমাত্র উৎস হল ঔষধ কোম্পানির দালালদের বক্তৃতা। চর্চা না করার জন্য অনেক সময় পুরানো দিনের ঔষধগুলির গুণাগুণও অনেকে ভুলে যান। এইরকম জ্ঞানভাণ্ডার মাথার মধ্যে রেখে রোগীর মুখের প্রথম বাক্য শেষ হওয়ার আগেই যান্ত্রিকভাবে প্রেসক্রিপশন লেখা শুরু করে দেওয়া ডাক্তারবাবুরা মাঝে-মধ্যেই ভুল করেন। কিন্তু এ 'ভুল' কে 'ভুল' বলার সাহস কার আছে? তাই দেখা যায় Pharmacology আর Medicine-তে (ঔষধ বিজ্ঞানের বই) যে ঔষধ বাচ্চাদের জন্য অথবা গর্ভবতী নারী বা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের জন্য নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা আছে— শিশুদের জন্য সিরাপ তৈরি করে সেগুলিও বাজারে আনছে ঔষধ কোম্পানিগুলি পয়সা কামানোর জন্য— আর ডাক্তারবাবুরাও অনেকেই নির্বিচারে গর্ভবতী মা বা শিশুদের জন্য সেসব ঔষধ দেদার প্রেসক্রিপশন করে চলেছেন। এছাড়া ঔষধের ডোজের ব্যাপারে— বিশেষত: শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে— অনেক ডাক্তারবাবুই ভুল করেন আর অসাবধানে বেশি ডোজ লিখে দেন। এইরকম অসাবধানতা শিশুদের এমন মারাত্মক ধরনের ক্ষতি করতে পারে, যেগুলি তাৎক্ষণিক ভাবে যদিও বা ধরা নাও পড়ে, পরবর্তী জীবনে এর প্রভাব এইসব শিশুর লিভার, কিডনি বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসহ নানা মারাত্মক রোগ, এমনকি মৃত্যুকেও ডেকে আনতে পারে। তাতে ডাক্তারবাবুদের আর কি? মানুষ তো আর দুটো ব্যাপারের মধ্যের সম্পর্ক ধরতে পারবে না।

ড. ফরটি পারসেন্ট

"...... সবে হল খাওয়া শুরু, শোনো শোনো আরও খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায় ...."

— সুকুমার রায়

সমাজের সর্বস্তরে চলছে ঘুষ আর দুর্নীতির চাষ— হবে না কেন বলুন— সবর্ত্রই যে অভাব; অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, মানুষের অভাব কি কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না?

উত্তর খোঁজার আগে সমাজের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা - সম্ভ্রম উদ্রেককারী, সবচেয়ে পবিত্র জীবিকা—চিকিৎসা ব্যাবসা— নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

আজকাল ডাক্তারবাবুরা এত তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় করতে পারেন যে, অধিকাংশ সময় রোগীদের থেকে রোগের ইতিহাসটুকু পুরোপুরি শোনারও প্রয়োজন হয় না। রোগীর কথা বলা শুরু আর ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন লেখা শুরু হয় একসঙ্গে। সেজন্য রোগীর কথা শেষ হওয়ার আগেই ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ হয়ে যায়। এরপর ডাক্তারবাবুর হাত থেকে প্রেসক্রিপশনটি নিয়ে চেম্বারের গেটে দাঁড়ানো ডাক্তারবাবুর অ্যাসিসটেন্টের হাতে দিয়ে লিখিত ঔষধগুলির (যদি থাকে) ব্যবহার বিধি জেনে নেওয়ার পর কী কী 'পরীক্ষা' করে কদিন পরে রিপোর্ট করতে হবে জেনে নিতে গিয়ে অবধারিতভাবে শুনতে পাবেন পরীক্ষাগুলি কোনো প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে করতে হবে— তার নাম। যদি ডাক্তারবাবু বা ওনার অ্যাসিসটেন্টের কথা মতো বিশেষ ল্যাবরেটরিটি থেকে টেস্টগুলি না করে দূরবর্তী জায়গার অন্য কোনো ল্যাবরেটরি থেকে তা করিয়ে নিয়ে পরের বার ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢোকেন, তাহলে কিন্তু ডাক্তারবাবুর গোমড়া মুখ দেখার সমূহ সম্ভাবনা। অনেক সময় ডাক্তারবাবু আপনার রিপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আগে বলা ল্যাবরেটরিতে আবার টেস্টগুলি করিয়ে আনতেও বলতে পারেন।

এই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল এক জেলা সদরের এক প্যাথলজিক্যাল সেন্টারের মালিকের সঙ্গে। কথায় কথায় জানলাম যে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষাগুলির রেট এত বেশি হলেও এগুলিতে ব্যবহার করা কেমিকেলের খরচ খুব বেশি নয়। রক্তের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার মতো বেশ কিছু পরীক্ষা করতে বাস্তবিক কোনো খরচই হয় না। আসল খরচ হয় অন্যত্র। জানলাম— কফ, থুথু, রক্তের নানান পরীক্ষা থেকে এক্স-রে— সমস্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রেই রোগীর কাছ থেকে পাওয়া অর্থের মাত্র শতকরা ষাট ভাগ (৬০%) পান প্যাথলজিক্যাল সেন্টারের মালিক, বাকি শতকরা চল্লিশভাগ অর্থ (৪০%) হিসেব করে নিয়মিতভাবে যে যে ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী পরীক্ষাগুলি করা হয়েছে— তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। অনেক সময় খুব বিখ্যাত ডাক্তারবাবুদের অ্যাসিসটেন্টের কাছে আবার অগ্রিম থোক টাকা মাসের প্রথমেই দিয়ে আসতে হয়— মাসের শেষে হিসেব মেলানো হয়। এই প্রথা নাকি সারা দেশেই চালু! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— আপনারা টাকা দেন কেন? উত্তর শুনে চমকে উঠতে হল— ডাক্তারবাবুদেরও হিসাব থাকে, তাই টাকা নিয়মিত না পৌঁছলে ডাক্তারবাবুর ওই প্যাথলজিক্যাল সেন্টারে আর রোগী পাঠাবেন না। এতেও নাকি খরচের শেষ নয়— প্যাথলজিক্যাল সেন্টারগুলিকে অন্য আর একদল ডাক্তারবাবুকেও অনেক টাকা দিতে হয়। প্যাথলজিক্যাল সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকেন প্যাথলজিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকা অথবা না থাকা যেসব ডাক্তারবাবুরা— তাঁরা কেউ কোনোদিন একটিও প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা নিজের হাতে করেন না, এমনকি এসব পরীক্ষা যখন এইসব ল্যাবরেটরিতে করা হয়— তখন ওনারা কেউই সেখানে উপস্থিতও থাকেন না, আর সেজন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলির ফলাফল নিজেরা চোখেও একবার দেখেন না। তাই স্যাম্পেলগুলির আদৌ কোনো পরীক্ষা হয়েছে কিনা তাও ওনারা জানেন না। এসব ডাক্তারবাবুরা প্রায় প্রত্যেকেই গাদা গাদা প্যাথলজিক্যাল সেন্টারের সঙ্গে কমিশন প্রথায় 'যুক্ত' থাকেন। এই কমিশনের পরিমাণটি বেশ মোটা রকম হলে কোনো কোনো ল্যাবরেটরিতে শুধু আগে থেকে টাইপ করে রাখা রিপোর্টের পাতাগুলিতে সই করার জন্য সারাদিনে একবার সন্ধে নাগাদ উনি আসেন। এছাড়া অধিকাংশ ল্যাবরেটরিতে ওনাদের সই করা সিল মারা ফাঁকা প্যাড দেওয়া তাঁকে আগে থেকেই। ল্যাবরেটরিতে যিনি 'পরীক্ষা' করেন—তিনি প্যাডের উপরের অংশে রোগীর নাম, বয়স, যে ডাক্তার রোগীকে পাঠিয়েছেন তার নাম এবং পরীক্ষার ফলাফলটা টাইপ করে দেন কেবল। প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে 'পরীক্ষা' করার কাজ করেন যারা— তাদের অধিকাংশেরই এই সংক্রান্ত কোনো ডিগ্রি-ডিপ্লোমা নেই, সবই দেখে দেখে শেখা। সুতরাং একটি মাইক্রোস্কোপ, একটি সেনট্রিফিউজ মেশিন, একটি ফ্রিজ ও একটি ক্যালোরি মিটার যন্ত্র সম্বল করে চলা ল্যাবরেটরিগুলি কী পরীক্ষা করে না করে তা সহজেই অনুমেয়। অথচ এইসব রিপোর্টের উপর নির্ভর করে রোগীর রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ নির্বাচন করেন ডাক্তারবাবুরা। কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্যের একজন মন্ত্রী কলিকাতার এক বড়ো ও নামি ল্যাবরেটরিতে ব্লাড-সুগার পরীক্ষা করতে গিয়ে এরকম এক কাল্পনিক

রিপোর্ট পেয়েছিলেন। মন্ত্রীমশাই বলে কথা— তাই এ নিয়ে কিছুদিন কিছু হইচই হল। আমরা সাধারণ মানুষ, তাই পড়ে পড়ে মার খাওয়াই বোধহয় আমাদের নিয়তি।

... এজন্যই ডাক্তারবাবু অন্য ল্যাবরেটরির রিপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে দেন।

এজন্যই প্যাথলজি পরীক্ষার চার্জ এত বেশি।

এজন্যই পেট ব্যথার রোগীকে বুকের-মাথার এক্স-রে করতেও পাঠানো হয়।

এজন্যই এক ল্যাবের রিপোর্টের সঙ্গে অন্য ল্যাবের রিপোর্ট অনেক সময়ই মেলে না।

এজন্যই ...

আচ্ছা, নিরীহ কেরানি থেকে ইনসিওরেন্স কোম্পানির বা পোস্ট অফিসের এজেন্ট— এদের ওপর ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে এত চাপাচাপি, কড়া নিয়মকানুন— অথচ ব্যবসায়ীদের আর চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে ভিজিল্যান্স থেকে আয়কর দপ্তর- সবাই চোখ বুজেই থাকে। আসলে সবাইয়েরই তো অভাব আছে।

আমরাও চোখ বুজে থাকি। কেন বলুন তো?

পাঁচ : দুর্নীতি যখন শিরা-উপশিরায়

চিকিৎসা ব্যবস্থা সংক্রান্ত যে কোনো ব্যাপারে দুর্নীতি নিয়ে কথা উঠলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এসে যায় ডাক্তারবাবুদের কথা— ওনারাই সমস্তরকম দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও পরিসেবাহীনতার জন্য দায়ী। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন মিডিয়ার প্রচার আমাদের এরকমটা ভাবতে অভ্যস্ত করিয়েছে — অথচ একটু তলিয়ে দেখলে এই ধারণার ভেতরের অসাড়তাগুলি সহজেই ধরা পড়ে। যে-কোনো জায়গায়— হাসাপাতাল, নার্সিংহোম বা ডাক্তারবাবুর চেম্বার— কোথাও চিকিৎসা পরিসেবা ব্যাপারটি শুধুমাত্র ডাক্তারবাবুর হাতের মধ্যে নেই— আরও অনেক মানুষের হস্তক্ষেপও এর মধ্যে থাকে। নার্স, ফার্মাসিস্ট, স্টোরকিপার, কম্পাউন্ডার থেকে ঝাড়ুদার— এরা সবাই একসঙ্গে নিজেদের কাজে চরমভাবে ফাঁকি না দিলে আমাদের হাসপাতালগুলির এই হাল হত না। কোনো প্রতিষ্ঠানের কোন ভালো কাজ সু-সম্পন্ন করার জন্য যেমন তার ছোটো-মাঝারি-বড়ো — প্রতিটি কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়— তেমনি কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার পেছনেও সম্মিলিতভাবে সবার 'চেষ্টা' থাকে, কেউই এজন্য দায়িত্ব এড়াতে পারেন না— আর বাস্তবে সব স্তরের কর্মচারী দুর্নীতিতে অংশ না নিলে দুর্নীতি রাজ চলতে পারে না। সেজন্য দুর্নীতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে 'সব ব্যাটাকে ছেড়ে ওই ট্যাঙা ব্যাটাকে ধর"— এই চলতি নীতির পুরোটাই ভুল। সেই হিসাবে নার্সিংহোমের মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের কর্মী, ঔষধ ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং হাসপাতালগুলিতে কর্মরত সব স্তরের কর্মচারী— সবাইয়ের প্রচেষ্টাতেই এ রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থায় মহামারি লেগে গেছে— অবিলম্বে চিকিৎসা করা দরকার। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অনেকেই জানেন যে লটারির টিকিট লেগে যাওয়ার মতো যদি কখনও

কোনো সহানুভূতিশীল (সম-মর্মী), মানবিক এবং সু-চিকিৎসক কোনো ডাক্তারবাবু কোনো সরকারি হাসপাতালে ট্রান্সফার হয়ে আসেন— কিছু দিনের মধ্যেই তিনি হাসপাতালের কাছাকাছি চলা নার্সিংহোমের মালিক আর তার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসককুল ও দালাল শ্রেণির মানুষ এবং শুধুমাত্র চেম্বারে প্রাকটিস করা ডাক্তারবাবু ও তাঁর উপর নির্ভর করে জীবিকা চালানো লোকজনের চক্ষু শূল হয়ে ওঠেন। হাসপাতালের অব্যবস্থায় এনাদের ব্যাবসায় রমরমা চলে— তাই এনারা সবসময়ই চান হাসাপাতালগুলিতে অব্যবস্থা চলুক। প্রথমে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুটিকে নিজেদের দলে টানার জন্য লোভ দেখানো, তাতে কাজ না হলে স্থানীয় সমাজবিরোধীদের ভাড়া করে সাজানো ঘটনায় ডাক্তারবাবুকে মারধোর করা বা ডাক্তারবাবুর ফ্যামিলিকে নানাভাবে উদ্‌বাস্তু ও উত্তক্ত করে ডাক্তারবাবুকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করার মতো পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয়। এছাড়া অন্যভাবেও এইসব ডাক্তারবাবুদের উত্তক্ত করার চেষ্টা করা হয়। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দূর-দুরান্তে যখন-তখন ট্রান্সফার করে দেওয়া, অফিশিয়াল ব্যপারে চিঠি-চাপাটি করে সব সময় টেনশনে রেখে দেওয়া, ঔষধ চুরি করে সেই দায় ডাক্তারবাবুর ঘাড়ে কায়দা করে চাপিয়ে দেওয়া, ইচ্ছে করে ভুল ঔষধ ব্যবহার করে ডাক্তারবাবুর অধীনে থাকা রোগীকে মেরে দিয়ে ওনাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া— এরকম বিচিত্র সব পদ্ধতি আছে এরকম 'বেয়াড়া' ডাক্তারবাবুদের 'সিজিন্‌ড়' করার। এসব সত্ত্বেও রোগীরা ও রোগীদের পরিবার-পরিজনরা কিন্তু ঠিকই বুঝে যান কোনো ডাক্তারবাবু ভালো— তাই হাসপাতালে সেই ডাক্তারবাবুর বহির্বিভাগে রোগী দেখার দিনই বেশি ভিড় হয়— মানুষ ওনার অধীনে হাসপাতালে ভরতি হতে চান বলে। এসব দেখে 'সুযোগ-সুবিধা' হারানো মানুষজন আরও খেপে যান। ডাক্তারবাবুর উপর চাপ দেওয়া ও তার ফ্যামিলির উপর অত্যাচার করা বা ভয় দেখানোর পদ্ধতিগুলোতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজ হয়ে যায়, দৈবাত এগুলিতে কাজ না হলে তার পরিণতি কী হয়, তা কদিন আগের 'নর্মাল পাল' বা 'সেনবাবুর' ঘটনার খবর হয়ে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে এসে গেছে। সেজন্য সুচিকিৎসা করার, মানুষের সেবা করার আদর্শ নিয়ে সরকারি হাসপাতালের চাকুরিতে ঢুকলেও দীর্ঘকাল কোনো ডাক্তারের পক্ষে এতরকম অত্যাচার সহ্য করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। আমার জানা এরকম এক ডাক্তারবাবু সরকারি হাসপাতালে কাজ করার সময় শিশু-চিকিৎসক হিসাবে দারুণ নাম করেছিলেন। শুধু বিভিন্ন মহলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চাকুরি ছেড়ে দিয়েছেন। এখন ৩০ টাকা ভিজিটে তমলুক শহরে বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস্ করেন— রোগী দেখে শেষ করতে হিমশিম খান।

বড়ো বড়ো হাসপাতালগুলির সামনে অপেক্ষমান 'সাহায্যকারী'দের নিয়ে মাঝে মধ্যে টুকটাক আলোচনা হয়। হাসপাতালে ভরতি হওয়ার জন্য আসা রোগীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া, ঔষধ-অক্সিজেন-রক্ত নিয়ে ব্যাবসা করা, সুযোগ পেলে ছিনতাই করা— এরকম নানান পুণ্যকর্মে যুক্ত থাকেন ওনারা। বড়ো সরকারি হাসপাতালের ক্যাম্পাসের মধ্যে কর্মচারীদের কোয়ার্টারগুলির একাংশ দখল করে এসব সাহায্যকারীরা কীভাবে বাস করেন,

আর মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নানান ফিকিরের বদমায়েশি করে বেড়ান— তার উত্তর বোধহয় রাজনীতিবিদরাই ভালো দিতে পারবেন। আমার জানা এক অজ-পাড়াগাঁয়ের কৃষক তার মৃত্যু-পথযাত্রী একমাত্র সন্তানকে কলিকাতার এক বড়ো হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভরতি করতে গিয়ে এরকম 'সাহায্যকারী'দের পাল্লায় পড়ে জমি বন্ধক দিয়ে নিয়ে যাওয়া দশ হাজার টাকা খুইয়ে নিজের ছেলের শেষ চিকিৎসাটুকুও করাতে পারেননি। "এরকম মতো কতই ঘটে।"

হাসপাতালের নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে করা ওনাদের ব্যবহার নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ শোনা যায়। অন্যান্য সমস্ত সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে যা হয়— এখানেও তাই হয়েছে— রাজনৈতিক দলের লেজুড় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটাকেই নিজেদের সমস্ত রকম দুনীর্তি, দুর্ব্যবহার ও ফাঁকিবাজি করেও পার পেয়ে যাওয়ার এক অমোঘ ব্যবস্থা বলে কর্মচারীরা মনে করে নিয়েছেন। চাকুরি হারানোর ভয় নেই, যা খুশি তাই করলেও কোনোরকম শাস্তি পাওয়ার ভয় নেই— সব ক্ষেত্রেই 'রাজনীতির টীকা' নেওয়া থাকার কারণে আর সংগঠন তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দেওয়ার কারণে "কারও কিছু করার হিম্মত নেই"— এই বিশ্বাস মনের মধ্যে থাকলে কেই বা কীসের পরোয়া করে? তা ছাড়া এইসব কর্মচারীদের অনেকেরই চাকুরিটি রাজনীতি করার উপহার স্বরূপ পাওয়া। আজ থেকে বছর বারো-তেরো আগে নকল মার্কসিট দেখিয়ে নার্সিং কলেজের অধিকাংশ আসন ভরতি করার এক বিরাট চক্রের খবর বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। উচ্চ-মাধ্যমিক ফেল করা বা কোনোক্রমে পাস করা মেয়েরা জাল মার্কশিটের ফার্স্ট ডিভিশন বা স্টার মার্কস দেখিয়ে নার্সিংতে ভরতি হয়েছিল। যেসব মেয়েরা সৎভাবে সঠিক নাম্বার দেখিয়ে আবেদন করেছিল— তারা কেউ সুযোগই পেল না নার্সিং পড়ার। সেই বছর কী কারণে যেন এক বিশাল সংখ্যার জাল-মার্কশিটে ভরতি ঘটনা হাতে নাতে ধরা পড়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর যথারীতি সব ধামাচাপা পড়ে গেল। নিন্দুকেরা বলে— এর সঙ্গে রাজনীতি জগতের এত বড়ো বড়ো সব 'মাথা' জড়িয়ে ছিল যে কান টানলে মাথা আসতে পারে— এই ভয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে চাপাচাপি করে সব ঢাকা দেওয়া হয়েছে। যেসব মেয়েরা এভাবে জাল মার্কশিট দেখিয়ে 'নার্স' হল— তারা অনেকেই হয়তো এখন সরকারি চাকুরিতে 'সিনিয়র' হয়ে গেছে— তাদের নৈতিক চরিত্রটি কি বদলে গেছে?

আমাদের রাজ্যে কর্মচারীদের 'নেতাদের' কোথাও কাজ করতে হয় না— এমন এক অলিখিত নিয়মই আছে। আজকাল এই নিয়মটি আরও প্রসারিত হয়ে গেছে— চ্যালাদের এবং তস্য চ্যালাদেরও আর এখন কাজ করতে হয় না। হাসপাতালের সাফাইকর্মীদের একাংশের দিনের পর দিন কাজে না আসার বা ডিউটির সময়ই মদ খেয়ে বেঁহুশ হয়ে থাকার 'অধিকার' 'অর্জন' করিয়ে দিয়েছেন নেতারা, কাজেই এরকম নেতাদের ক্ষমতা আছে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার। (অবশ্য হাসাপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে রাখার ক্ষমতা কিন্তু এদের নাই, তা

করতে বললে চ্যালারা নেতা বদলে ফেলবে!) একই রকম অবস্থা চলছে সর্বত্র।

হাসপাতালের ছাপমারা ঔষধ বাইরের ঔষধ দোকান থেকে পাওয়া যাওয়া সংক্রান্ত খবর মিডিয়াগুলির মাধ্যমে মাঝে-মধ্যেই আমাদের সামনে আসে। তবে তা নিয়ে কোনোদিন কোনো অনুসন্ধান হয় কি? আজকাল রোগীকে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হলে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে পাগলের মতো এক ব্লাড-ব্যাঙ্ক থেকে অন্য ব্লাড-ব্যাংক ছুটে বেড়াতে হয়— যদিও সঠিক পথে গিয়ে সঠিক লোককে মূল্য ধরে দিতে পারলে তা হাসাপাতাল সংলগ্ন ব্লাড ব্যাংক থেকেই পাওয়া যায়। রক্তের মধ্যে এইড্‌স্ সহ নানান মারাত্মক রোগ-জীবাণুর উপস্থিতি পরীক্ষা করার Test kit- সহ নানা দামী কেমিক্যাল ব্ল্যাড ব্যাংক থেকেই বেসরকারি ল্যাবোরেটরিগুলির একাংশ নিয়মিত 'কেনে'— এ খবর যারা জানার তারা সবাই জানে। অ্যাতো সব ব্যাপারে অ্যাতো দুর্নীতি— অভিযোগ কি জমা পড়ে না? আমাদের দেশের অদ্ভুত নিয়ম— ডাক্তারের দুর্নীতি খোঁজার জন্য অন্য ডাক্তার, চিকিৎসা কর্মীদের দুর্নীতি খোঁজার জন্য অন্য কর্মী ও ডাক্তারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যথারীতি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় নিজেদের মধ্যে 'বোঝাবুঝি' করে নিয়ে অশ্বডিম্ব রিপোর্ট প্রসব করাই এইসব অনুসন্ধান কমিটির একমাত্র কাজ।

—

বিষয় : স্বাধীনতা আন্দোলন

এক : নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি একটি খোলা চিঠি

মাননীয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের নেত্রী বর্গ,

অনেকদিন ধরে একটু একটু করে জমিয়ে জমিয়ে অনেকটা সাহস বুকের মধ্যে জমা হওয়ার পর এই চিঠি লেখার জন্য কলম ধরতে পেরেছি। একে তো এই প্রসঙ্গটিতে সারা পৃথিবীর বিদ্বজ্জন এতটাই একমত, যে ভয় হয় হয়তো বা চিঠিটি পড়ার মতো ধৈর্যও কারর হবে না — তার আগেই রে রে করে সমালোচনার ঝড় হয়ে তাড়া করে আসতে থাকবেন সবাই, আর নতুবা শুধুই তাচ্ছিল্য করে পড়ার অযোগ্য মনে করে বাজে কাগজের ঝুড়িতেই হবে এ লেখার স্থান। তবুও কিছু কথা না বলে পারছি না।

আজকের পৃথিবীতেও কয়েক কোটি প্রজাতির জীব আছে — যারা চিরতরে হারিয়ে গেছে, তাদের বাদ দিয়ে। এই জীবকুলের প্রতিটি সদস্যই কিন্তু নিপীড়িত, কারণ বিবর্তনের নিয়মাবলি কোনো একটি জীবকেও সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছে মতো বেঁচে থাকার স্বাধীনতা দেয়নি। প্রশ্ন উঠতে পারে- ব্যাকটিরিয়া, কেঁচো, ঘাসফড়িং আর মানুষ কি এক? এক যে নয় তা তো সবাই জানে, তবে মানুষও এই পৃথিবীর একটি জীবমাত্র- তবে সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব। নিজের বুদ্ধির বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ তাই পৃথিবীর বাকি সমস্ত জীবের উপর অত্যাচার চালানোর এবং সমস্ত জীবের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে তাদের নিজের ইচ্ছেমতো চালনা করার স্পর্ধা রাখে। এর শেষ ফলাফল ভালো না খারাপ - তা অন্য প্রশ্ন। তবে মানুষের এই ভূমিকাও কিন্তু বিবর্তনের নিয়মবিরুদ্ধ নয় - দুর্বলের উপর সবলের অধিকার, যদিও সভ্যতার আদর্শ এর বিরুদ্ধে লড়াই করার কথাই বলে।

সুতরাং নারীর অধিকার অর্জনের লড়াই বা স্বাধীনতার লড়াই,যে নামেই ডাকা হোক না কেন - এই পুরো ব্যাপারটাই মানুষ প্রজাতির নিজস্ব সমস্যা। মানুষের সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে প্রমাণ থেকে গেছে - চিরকাল অর্থ ও ক্ষমতাবান মানুষ দুর্বল মানুষদের উপর অত্যাচার করে গেছে। বস্তুত মানব সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার একটা বড়ো কারণ হল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতদের লড়াই। এ লড়াই এখনও চলছে, সম্ভবত চিরকালই চলবে। অত্যাচারীদের পতন যদিও বা সম্ভব, অত্যাচারের পতন সহসা সম্ভব নয়, কারণ পূর্বতন অত্যাচারিতদের এক অংশ সুযোগ পেলেই নতুন অত্যাচারীতে পরিণত হবে। পৃথিবীর নানান রাষ্ট্রের শাসক রাজবংশগুলির উত্থান-পতনের ইতিহাস থেকে আমাদের দেশের 'স্বাধীনতা' পাওয়ার ইতিহাস সেই কথাই বলে। ব্যক্তি মানুষের মনে যতদিন অন্যের উপর ক্ষমতা জাহির করার লোভ থাকবে, ততদিন তারা 'নেতা' হওয়ার সুযোগ খুঁজবেন, আর ততদিন অত্যাচারীদের আসন

ভরানোর লোকের অভাব হবে না। এখন তো সারা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষ দখল করার লড়াইকে (ব্যক্তিগত স্তর থেকে রাষ্ট্রীয় স্তর- সর্বত্র) সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার সঠিক রাস্তা বলে মেনে নিয়েছে বা নিতে বাধ্য হয়েছে। সে জন্য অত্যাচারিতদের 'নেত্রীবর্গের' উদ্দেশ্যেই অনেকসময় থাকে অত্যাচারীকে হঠিয়ে তার শূন্য চেয়ার দখল করা- তাই অত্যাচারিতের নেতাদের অত্যাচারীতে রূপান্তরিত হওয়া সেক্ষেত্রে কেবল সময় আর সুযোগের অপেক্ষামাত্র। 'সাম্য' বিষয়টি সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা করা যত কঠিন, নিজেকে সেই ধারণার সত্যিকারের বাহক করে রাখা এবং সেই আদর্শ সারাজীবন নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা তার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন। চারিদিকে এত 'আন্দোলন', অথচ 'সাম্য' ব্যাপারটি সত্যি সত্যি কত জন চান, তা ভাবার বিষয়। তুমি আমার চেয়ে উপরে আছ, তোমাকে আমার স্তরে নামিয়ে আনা আমার কাছে 'সাম্য' ধারনা। এটা অর্জিত হলেই আমার প্রথম চেষ্টা থাকবে তোমার চেয়ে ওপরে ওঠা- এই হল প্রায় সমস্ত মানুষের অন্তঃস্থিত স্বাভাবিক মানসিকতা। এই মানসিকতা থাকলে কিন্তু সাম্য সম্পর্কে সঠিক ধারণাই তৈরি হয় না। পৃথিবীর সমস্ত তথাকথিত 'সাম্য' আন্দোলনকে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে অনেক উত্তর না পাওয়া প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

স্বার্থচিন্তাহীনভাবে অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হল এক মহৎ মানসিকতা- যা খুব কম মানুষের মধ্যে দেখা যায়, যদিও মানব সভ্যতা এর ফলেই এগিয়ে চলে। কিন্তু শুধুমাত্র ভোগ্য সুযোগ-সুবিধাগুলি বা সামাজিক সম্মান ব্যক্তিগত স্তরে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অত্যাচারিতদের দাবার বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করা এক অতি নীচ মানসিকতার পরিচয়, যদিও এই পরিচয়ই আমরা পাই আমাদের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের বঙ্গীয় বা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যও খুব পরিষ্কার নয়। বস্তুত: কোন্‌টা সত্যিকারের আন্দোলন, আর কোন্‌টা শুধুই সুযোগ-সুবিধা অর্জনের দাবা খেলা-তার পার্থক্য বোঝা খুব সহজ নয়। কয়েকটি অন্যরকম কথা বললে রাগ হবে না তো? আমাদের উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই প্রায় সমস্ত নারীবাদী নেত্রী রা এসেছেন। এনাদের অধিকাংশই জীবিকার জন্য কোনো পরিশ্রমের কাজকর্ম করেন না। এই শ্রেণির মহিলাদের আমরা কেমন জীবনযাপন করতে দেখি? উৎপীড়িত নারীদের অধিকার সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে সভাসমিতিতে এনারা অনেকেই যান, অথচ এনারা কেউই প্রতিদিন নিজের খাবারটা রান্না করেন না বা নিজের জামা-কাপড়গুলো কাচাকাচি করেন না, বাসন মাজা বা ঘরে ঝাড়ু দেওয়া অনেক পরের ব্যাপার। সবক্ষেত্রেই এজন্য বাড়িতে 'কাজের লোক' রাখা আছে। এই 'কাজের লোকেরা' অধিকাংশই হয় গ্রাম থেকে আনা কিশোরী, বা গরিব ঘরের বউ অথবা অসহায় বিধবা। মাসিক 'রোজগার' এদের সবসময়ই পাঁচ-সাতশো টাকার মধ্যে। বাড়ির কর্ত্রী মাসে যে টাকার কসমেটিক্‌স্‌ ব্যবহার করেন তাও এই বেতনের বেশ কয়েকগুণ। কাজের মেয়েরাও কিন্তু সবাই নারী। একটি সমীক্ষা করলেই বেরিয়ে আসবে এইসব 'নারী'দের প্রতি নেত্রীদের ব্যবহারের আসল রূপ। অবশ্য এজন্য সমীক্ষকদের সত্যিকারের সৎ হতে হবে।

আপনাদের পূর্বসূরি একজন নারীবাদী নেত্রীর লেখা পড়ে প্রথমদিকে বেশ যুক্তিবহ ও সুস্থ চিন্তার বলে মনে হত। তখন অবশ্য তিনি 'নেত্রী' হননি, বিখ্যাতও হননি। এরপর একটুখানি নাম করার পর বোধহয় নামের আর বিতর্কিত হওয়ার মোহ ওনাকে পেয়ে বসল। এক পূজাবার্ষিকীতে পড়লাম ওনার এক 'কবিতা' । কবিতার বক্তব্য—নারীর যৌনাঙ্গের আশেপাশে লোমের মধ্যে বসবাস করা 'যৌনকীট'দের মতো হল সমস্ত পুরুষ। এরপর আর কোনোদিন ওনার কোনো লেখা উলটে দেখারও ইচ্ছে হয়নি। অবশ্য ওনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে - উনি বিতর্কিত ও বিখ্যাত হতে পেরেছেন - তাতে কাজের কাজ কী হল তা উনিই কেবল জানেন।

'নারীবাদী' আন্দোলন আর পুরুষ বিদ্বেষী খেউড় করা যখন সমার্থক হয়ে যায়- তখন তা যে রুচিশীল ও সংবেদনশীল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায় - একথাটি প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার। সমস্ত বিরোধী ও অপ্রিয় আলোচনা ধৈর্য ধরে শোনার ও তারপরে যুক্তি দিয়ে প্রয়োজনে তার বিরোধিতা করার প্রয়োজনীয়তাটি না বুঝতে পারলে কারওরই নিজেকে যুক্তিবাদী বলে মনে করা উচিত নয়। অপ্রিয় সব বক্তব্যই যেমন সত্য নয় তেমনি সত্যকে সবসময় প্রিয় হতেই হবে - এ দাবি করতে পারে কেবল মূর্খরা। ইউরোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলির কথা জানি না - আমাদের দেশে নারীবাদ হয়ে গেছে এক বিশেষ শ্রেণির নারীদের সুবিধাবাদ অর্জনের এক ফিকির - 'সাম্য' চাওয়া কোনো আন্দোলন নয়। দুর্বলের প্রতি সবলের সব ধরনের অত্যাচার- তা সে ধর্ম, জাতি বা বর্ণের কারণে হওয়া অত্যাচারিই হোক, ধনীর দ্বারা গরিবের উপর হওয়া অত্যাচারই হোক বা ক্ষমতাধারী দলের বা ব্যক্তি বর্গের দ্বারা ক্ষমতাহীনদের উপর করা অত্যাচারই হোক - সব ক্ষেত্রেই সাম্যের ধ্বজাধারীদের থাকা উচিত নিপীড়িতের পক্ষে, নিপীড়িতের পাশে। তা না হয়ে নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজন পড়লে নিপীড়িতের পাশে আর অন্যসময় উলটোদিকে থাকা এক ধরনের ধান্দাবাজি ছাড়া কিছু নয়। শুধু নারীবাদী আন্দোলন নয়, আমাদের দেশে নানারকম 'সাম্যের' উদ্দেশ্যে ঘোষিত আন্দোলনগুলি হয়ে গিয়েছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের নিজের কোলে ঝোল টানার সুবিধাবাদ অর্জনের জন্য ব্যবহৃত এক হাতিয়ার। সেজন্য সত্যিকারের গ্রহণযোগ্যতা কিছুদিনের মধ্যে হারিয়ে এগুলি হয়ে যায় সাজানো আন্দোলন আন্দোলন খেলা। আমাদের কোনো নারীবাদী মনে করেন না (অন্তত মনে মনে বিশ্বাস করেন না) যে দুর্বল স্বভাবের পুরুষরাও কোনো-দজ্জাল স্বভাবের মহিলা দ্বারা অত্যাচারিত হতে পারেন। নাকি মহিলা কখনও দজ্জাল হতে পারেন না, আর পুরুষরা কখনও ভদ্র-সহানুভূতিশীল হতে পারেন না — এমন স্থির বিশ্বাসী মন না থাকলে নারীবাদী হওয়া যায় না? আমরা দাম্পত্য জীবনের অত্যাচার বলতে বুঝি নানা কারণে তর্কাতর্কি, চড় -থাপ্পড় মারা আর তার পরবর্তী স্তরের ঘটনা হল মানসিক অত্যাচারের ফলে (আবেগতাড়িত হয়ে নয়!) আত্মহত্যা করা। একজন মানুষের অন্য একজন মানুষের উপর করা অত্যাচার সবসময়ই এরকম মোটা দাগের হবে — এই সিদ্ধান্ত হল এক ধরনের খণ্ডচিন্তা - সম্ভবত: অসুস্থ চিন্তাও - কারণ আর যাইহোক এটি আদৌ কোনো সুস্থ ও পূর্ণ চিন্তার প্রকাশ নয়। শারীরীকভাবে সবলতর পুরুষই কেবলমাত্র পারে শারীরীকভাবে

দুর্বল নারীর উপর অত্যাচার করতে, আর তর্কের নামে বাক্যবাণ ব্যবহারে ও নানান কৌশলে মানসিক অত্যাচার করতে পটু 'আলোকপ্রাপ্তা' মহিলারা কখনও অত্যাচারী হতে পারেন না — এমন ধারণা বাস্তব অবস্থাকে সমর্থন করে না। মধ্যবিত্ত সংসারে, যেখানে শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ- জায়ের কোনো উপস্থিতিই নেই, সেখানে কিন্তু অত্যাচারিত পুরুষদের অহরহই দেখা মেলে। তবে তাদের উপর হওয়া অত্যাচার তাদের কাছে যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন, অন্যদের চোখে তা পারতপক্ষে ধরা পড়ে না। নানান পারিপার্শ্বিক কারণে (লোকলজ্জা, সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা ইত্যাদি) পুরুষরা এগুলি প্রকাশ করতে পারেন না— তাই মনের মধ্যে জমে থেকে থেকে এইসব যন্ত্রণা শুধু মানসিক রোগী আর হৃদরোগীদের সংখ্যা বাড়ায়।

পুরুষদের সবসময় অত্যাচারী আর সুবিধাভোগী দেখানোটা যেন নিয়ম হয়ে গেছে। নারীরা নারী বলে কি কোনো বিশেষ সুবিধা নেন না? আপনারা, সাম্যপ্রার্থী নারীবাদী আন্দোলনকারীরা কী বলেন? চাকুরিরতা 'মহিলা' বলে বা ি র কাছাকাছি পোস্টিং পাওয়া, রেলস্টেশনে টিকিটের আলাদা লাইন বা লেডিজ বাস- সিট-ফিট নিয়ে নয় — খোদ শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে এরকম সুবিধে নেওয়ার হাজারও উদাহরণ আছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অবশ্যই চাকুরিক্ষেত্রে যেহেতু শিক্ষকদের এবং 'ওপরআলা'-দের অধিকাংশই পুরুষ - এবং এদের একাংশের বিশেষ প্রত্যঙ্গের 'দোষ' আছে - কাজেই এইসব সুযোগ-সন্ধানী পুরুষ এবং সুযোগ দান করে সুবিধে বাগিয়ে নেওয়ায় ইচ্ছুক মহিলা- এই পরিচয়ের বাইরে না বেরিয়েই অনেক কিছু করেন। এই ধরনের 'সুবিধা' জোগাড় করে নিজের 'ক্যারিয়ার' ভালো করে নেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু 'সচেতন আলোকপ্রাপ্তা' মহিলাদের একাংশই জড়িয়ে থাকেন— অধিকার সচেতনহীনা, নির্যাতিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হিসাব অনুযায়ী অশিক্ষিতা মহিলারা এসবের মধ্যে থাকেন না, থাকার সম্ভাবনা নেইও। এছাড়া নারী - পুরুষ উভয়ের সংশ্লিষ্ট সামাজিক কেচ্ছা - কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হয়ে গেলে সবক্ষেত্রেই, কী সামাজিক হিসেবে, কী আইনি ব্যবস্থায়-পুরুষদেরই একমাত্র দায়ী বলে মনে করা হয়, যদিও বাস্তবে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

নিরীহ ছাপোষা কেরানির গিন্নির কথা বাদই থাক, গ্রামের গরিব কৃষক পরিবার, শহুরে ভাড়াঘরবাসী বা বস্তিবাসী পরিবারে বসবাসকারী অগুন্তি খেটে খাওয়া মহিলাদের সমস্যাগুলি আপনারা জানেন তো? বাস্তবে আপনাদের তো কখনও দেখি না ১২-১৩ বছরের মেয়েদের বিয়ে হওয়া নিয়ে, বিয়ের নামে নারী পাচার হওয়া নিয়ে, কাজের মেয়েদের উপর হওয়া নানান ধরনের অত্যাচার নিয়ে বা নুতন বউ পাওয়ার নেশায় আবার বিয়ে করার লোভে তালাক দেওয়া পুরুষের তালাক পাওয়া পরিত্যক্ত পুরানো স্ত্রী ও তার সন্তানদের নিয়ে কোনো ভাবনাচিন্তা করতে। আপনারা অবশ্য অন্যান্য নানান বিষয় নিয়ে 'আন্দোলন' করেন। আপনাদের এইসব আন্দোলন সমাজের কত শতাংশ নারীর জন্য - সে হিসেবটা করা আছে তো ? যে আন্দোলন একটি দেশের সমস্ত নারীর মাত্র এক বা দুই শতাংশের সমস্যা নিয়ে সংগঠিত হয়, তার কি কোন সত্যিকারের মূল্য আছে ? কোনো একদল সরকারি কর্মচারীর

বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন বা সরকারের কোনো দপ্তরের ট্রান্সফার-প্রোমোশন নিয়ে আন্দোলন - এসব যেমন সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ছাড়া অন্যদের মনে কোনো ছাপ ফেলে না, তেমনি যতদিন নারীবাদী আন্দোলন মাত্র এক বা দুই শতাংশ নারীর অধিকার অর্জনের (সুবিধা অর্জন?) লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, ততদিন যতই তা মিডিয়া বা আইন ব্যবস্থার সাহায্য পাক, সাধারণ নারীদের কাছে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন হয়েই থাকবে। কোনোরকম কষ্ট সহ্য না করে, সরকার বা সংখ্যাগুরু - সংখ্যালঘুদের গুরুবাহিনী-সহ কোনো প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাশালী শক্তিকে না চটানোর সংকল্প নিয়ে, ড্রয়িংরুমে বসে বিদেশি নারীবাদী আন্দোলনের খবর পড়ে আর সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করে 'নেতৃত্ব' দিয়ে কোনোদিনই কোনো কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস যে হয় না, কি করি বলুন তো ?

অলমিতি

দুই : ব্যক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলন - অন্য দৃষ্টিতে

পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তি, মহিলাদের উপর পুরুষদের, সমাজের, রাষ্ট্রের করা অত্যাচার থেকে মুক্তি, স্বাধীন জীবন-যাপনের অধিকার, শিক্ষা থেকে জীবিকাঅর্জন - সর্বত্র পুরুষদের সমান অধিকার, সন্তানের অভিভাবক হিসাবে স্বীকৃতি -- এই ধরনের বেশ কিছু উদ্দেশ্য ও দাবি নিয়ে শুরু হয়েছিল নারীদের বন্ধন মুক্তির আন্দোলন। মহিলাদের সতীত্ব-সহ পুরুষ-মহিলার মধ্যে বৈষম্য নির্দেশকারী সমস্ত বস্তাপচা ধারণার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল। এই আন্দোলন অনেক দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছে – আর অধিকারও অর্জিত হয়েছে অনেকটাই, অন্তত ইউরোপ-আমেরিকার মতো দেশগুলিতে, যেখান থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। প্রত্যাশা মতোই, আমাদের দেশেও এই ধারায় আন্দোলন চলেছে, চলছে; অন্তত সমাজের উচ্চবিত্ত অংশে এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে অনেকটাই। এই আন্দোলন এখনও সারা পৃথিবীতেই চালু , তবে প্রথম দিকের দাবিগুলি অর্জিত হয়ে যাওয়ার পর এখন অন্যান্য আরও অনেক দাবি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে এই আন্দোলনের পথ ধরেই শুরু হয়েছে যৌনকর্মীদের ও সমকামীদের নানা দাবীসহ আন্দোলন। অবশ্য অ-যৌনকর্মী, অ-সমকামী পুরুষদের এরকম কোনো বড়োসড়ো আন্দোলনের খবর নেই, কারণ তাদের সমস্ত অধিকারই অর্জিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। আমাদের রাজ্যের পীড়িত পতি পরিষদের মতো কিছু কিছু 'সংগঠন' অন্য কথা বললেও তা বিশেষ কল্কে পায় না।

এখন বোধহয় সময় এসে গেছে একটু পেছন ফিরে দেখার। আন্দোলন চলুক - তবু এতদিনের আন্দোলনের ফলে কী কী অর্জিত হয়েছে এবং তার জন্য কী কী মূল্য চুকিয়ে দিতে হয়েছে - তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তা মনে হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উন্নত দেশগুলিতে এবং আমাদের দেশের উচ্চবিত্ত জনসমাজে নারী-পুরুষের খোলাখুলি মেলামেশা, যৌন স্বাধীনতা ও জীবনযাপনের সব ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও নৈতিক বাধ্য-

বাধিকার হাত থেকে মুক্তি মিলেছে। রাষ্ট্র ও সমাজ পুরুষ ও নারীদের একইরকম স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে 'মুক্ত' সমাজব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। 'যৌনকর্ম' আর লুকোছাপার বিষয় নয় — যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি আর কাজের অধিকার প্রয়োগের পথে সবরকম রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ প্রায় তুলে নেওয়া হয়েছে। সমকামী-সমলিঙ্গের 'বিয়ে' ব্যাপারটিও আইনসিদ্ধ হওয়ার পথে। কিন্তু সমস্যা হল এইসব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বধারিতভাবে কিছু By Product - ও মানুষ অর্জন করে ফেলেছে যে! এগুলির মধ্যে প্রধান হল নানান যৌনরোগ--বিশেষত AIDS -এর ব্যাপক প্রসার হওয়া, সামাজিক ও নৈতিক বন্ধনের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির ফলস্বরূপ মদ আর নানান মারাত্মক মাদক দ্রব্যের প্রতি আমৃত্যু প্রেমে পড়ে যাওয়া (addicted) মানুষের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি, Single parent children-এর নানান সমস্যা এবং অতি তীব্র হারে বেড়ে চলা মানসিক অবসাদের (Depression) রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি। বিষয়গুলি নিয়ে একটু ভাবা যাক।

পরিবার (family) ব্যাপারটি ইউরোপ-আমেরিকাতে প্রায় উঠে যাওয়ার পথে - অন্ততঃ আমরা ভারতীয়রা পরিবার বলতে যা বুঝি - সেই অর্থে। আমাদের দেশেও যৌথ পরিবার বলে আর কিছু নেই - যা আছে তা হল স্বামী-স্ত্রী ও বাচ্চাদের 'নিউক্লিয়ার' ফ্যামিলি। সচ্ছল পরিবারে বাচ্চা বলতে একটি বা কখনও দুটি শিশু সন্তান। এরকম অনেক পরিবারেই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকুরি করেন - তাই বাচ্চা বড়ো হয় বাড়ীর কাজের মেয়ের কাছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পরে বাড়ী ফিরে স্বামী-স্ত্রী কে কাকে দেখে তার ঠিক নাই, বাচ্চাকে সময় দেওয়ার মানসিকতা বা সামর্থ্যও তাই প্রায়শই কারর থাকে না। 'শিক্ষিত' বাবা-মা তাই নিজেদের সময় দেওয়ার অক্ষমতা পূরণ করতে চান বাচ্চাদের দামি দামি গাদাগাদা খেলনা বা জামাকাপড় দিয়ে। খেলনাগুলিও অধিকাংশই বন্দুক-পিস্তল বা ভিডিয়োগেম ধরনের - কারণ বাড়ির মধ্যেই সবসময় খেলা যায় এমন জিনিস না দিলে ছেলে বাড়ির বাইরে গিয়ে খেলতে চাইবে, ফ্ল্যাট-কালচারে থাকতে অভ্যস্থ হওয়ায় যার সুযোগও যেমন কম, তেমনি নজরদারি সংক্রান্ত ঝুঁকিও থেকে যায় এর পেছনে। এছাড়া বাচ্চাদের জোটে মারদাঙ্গার কিছু কমিক্স, সিডি আর টেলিভিশন সেট। বাড়ীর কাজের মেয়ের সঙ্গে থেকে থেকে তাকেই বেশি নকল করতে শেখে বাচ্চারা—বাবা-মা তো অনেক দূরের মানুষ। ফাঁকা বাড়িতে বাড়ির কাজের মেয়েটিও দুপুরে টেলিভিশনে যা দেখে, বাচ্চারাও তাই দেখতে অভ্যস্থ হয়। অ্যাতো সমস্যা, তবু অধিকাংশ বাড়িতে দাদু-ঠাকুরমার প্রবেশাধিকার নেই। নিজের রক্তের সম্পর্কের তৃতীয় প্রজন্মের প্রতি যে স্বাভাবিক স্নেহ-মমতা বাচ্চারা পেতে পারত - তা থেকে বঞ্চিত হয়ে একা একা বড় হতেই শেখে তারা। কাকু-জেঠু-পিসি-মাসি-ঠাকুমা-দাদু এবং নানান সম্পর্কের ভাইবোনেদের যে পরিমণ্ডলে আগের প্রজন্ম অবধি ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়েছিল, যার ফলে সমাজ ও সামাজিক ব্যাপারগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা একদম ছেলেবেলা থেকেই তৈরি হয়ে যেত নিজে থেকেই—তার সুযোগ এখনকার বাচ্চারা পায় না। এরপর একটু বড়ো হলেই পড়াশোনা করার চাপ শুরু হয়, যা বাচ্চাদের শেখায় যে কৌনো মূল্যে ভোগ্যপণ্য অর্জনের জন্য অনেক টাকা রোজগার করাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সাহিত্য, শিল্পসহ সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি এবং

সুকুমার বৃত্তিগুলিকে জীবনে ও চরিত্রে পরিস্ফুট করার কোনো চেষ্টাই থাকে না কোনো তরফ থেকেই। ফলে ভবিষ্যতের যন্ত্রমানবের সৃষ্টি হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। উন্নত দেশগুলিতে এই সমস্যা ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে গিয়েছে — স্নেহ-মমতার পরিবেশে বড়ো না হয়ে হিংস্র সিনেমা, বন্ধুক পিস্তলের মতো খেলনা আর আত্ম-সর্বস্ব জীবনযাপনে অভ্যস্ত শিশুরা তাই কিশোর বয়সেই অকারণে ক্লাসঘরের মধ্যে সহপাঠীদের গুলি চালিয়ে খুন করার মতো নানান অপরাধ করেও নির্লিপ্ত থাকে।

পশ্চিমি দেশগুলিতে জনসংখ্যা অনেক কম— তাই প্রায় সবাইয়ের রোজগার করার উপযোগী নানান চাকুরি আছে—আমাদের দেশের অবস্থা তেমন নয়। এক দম্পতি যদি বা মোটামুটি সচ্ছলভাবে জীবনযাপনের উপযোগী অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হন তো একশো দম্পতি তাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে অসুখী জীবনযাপন করতে থাকেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবহীন হয়ে ভাড়া করা বাড়িতে বা ফ্লাটে অথবা কেনা ফ্ল্যাটে শেকড়হীন জীবনযাপন করতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না, সবে অভ্যস্ত হচ্ছি। স্বভাবতই এই ধরনের জীবনযাপনের সহযোগী অন্যান্য সুস্থ উপকরণগুলির অভাব আমাদের নিঃসঙ্গতাই শুধু বাড়িয়ে দেয়। গল্প, আড্ডা বা খেলা— এসবের জন্য বিদেশে 'ক্লাব' থাকলেও সেরকম কোনো কালচার গড়ে ওঠেনি এদেশে। ফলে অবসর যাপন আর নেশা করা সমার্থক হয়ে যায় অনেকের কাছে।

পশ্চিমি ধারণায় শরীর একটা বড়ো ব্যাপার, মানসিক ব্যাপার-স্যাপারের গুরুত্ব এর অনেক পরে স্থান পায়। শরীরিক (যৌন) চাহিদা, শারীরিক সম্পর্কের স্বাধীনতা — এসব কোনো অবস্থাতেই কোনোভাবে সংযত করার ভাবনা এই ধারণার অঙ্গ নয়। বিবাহিত — বিবাহিতাদেরও একাধিক যৌন-সঙ্গী থাকা এসব দেশে সামাজিক ভাবেও স্বীকৃত। কিন্তু শারীরিকভাবে ভোগ করার ক্ষমতাও সীমাহীন নয় — আর মানুষের জীবনের পুরো আয়ুষ্কালের প্রায় অর্ধেক সময় এই ক্ষমতা ছাড়াই বাঁচতে হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে আবার এই অক্ষমতার কালটি পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া ভোগ-বাসনার তীব্রতাও সব বয়সে সমান থাকে না — এর তীব্র অবস্থা বছর কুড়ির বেশি স্থায়ী হয় না। সুতরাং এই কুড়ি বছর বাদ দিয়ে বাকি সময়টা কিন্তু মানুষকে যৌনতা ছাড়াও আরও অনেক কিছু নিয়েই বাঁচতে হয়, আর সেই সময় সঙ্গীহীন অবস্থায় একা একা বেঁচে থাকা কঠিন। কিন্তু স্বার্থমগ্ন উদ্দাম জীবনযাপনের অবসানে একার জন্য বাঁচার সময় বিনা স্বার্থে সঙ্গ দেওয়ার জন্য কেই বা এগিয়ে আসবে? বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের একে অপরের সঙ্গে মেলা-মেশা করা কিন্তু এই ধরনের একাকিত্ব থেকে তাদের বাঁচাতে পারে না—কারণ পরস্পর সম্পর্কহীন মানুষজনের গড়ে ওঠা সম্পর্কের মধ্যে আন্তরিকতা খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। তা ছাড়া আমাদের দেশে মধ্যবয়সি প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়াদের খুব অল্প অংশই বৃদ্ধাশ্রমে থাকেন, সেজন্য এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে একাকিত্ব এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। স্বাধীন জীবনযাপনের সঙ্গে মানসিক অবসাদের সম্পর্কটা এখানেই।

মহিলাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি অনেক বেশি তীব্র। নারী শরীরের আকর্ষণ পুরুষের কাছে যেমন অমোঘ, তেমনি খুব তাড়াতাড়ি তা ফুরিয়েও যায়। সেজন্য যেখানে আকর্ষণ শুধুই শরীর নির্ভর, সেখানে এর পর পুরুষকে আকর্ষণ করে আর পাশে পাওয়া যায় না। সেখানে এরকম অবস্থায় পুরুষ অন্য নারীতে আকর্ষিত হবেই। পুরুষের যৌন-সক্ষমতার সময়সীমা যেহেতু নারীর চেয়ে বেশি— সেজন্য এই সমস্যা থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই।

নারী-পুরুষের সমানাধিকার পাওয়া রাষ্ট্রগুলিতে বিয়ে বা লিভ-টুগেদার সবসময়ই হয় পারস্পরিক স্বার্থের হিসেব-নিকেশ করে। এরকম নারী-পুরুষ একসঙ্গে থাকার সময়ও পারস্পরিক বিশ্বাস, নির্ভরতা, আস্থা- এসব ব্যাপার গড়ে ওঠে খুব কম ক্ষেত্রেই। এরকম সম্পর্কের মধ্যে কোনো একজনের স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে বা বদলে গেলে সে স্বাধীন হতে চাইবে। রাষ্ট্রের আইন তার পক্ষে। লিভ-টুগেদারের ক্ষেত্রে তো আইনের কোনো বালাইও নেই। এই স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিটি যদি হন কোনো মেনোপোজ হয়ে যাওয়া নারীর পুরুষ-সঙ্গী, আর নারীটি যদি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হন, তাহলে তার অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশের লিভ-টুগেদারের সাওয়ালকারীগণ একথা স্মরণে রাখলে ভালো করবেন, কারণ বিদেশের মতো এদেশে চাকুরি বা উপার্জন করার রাস্তা আদৌ মসৃণ নয়।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বদলে যাওয়ার পথে 'বিয়ে' ব্যাপারটি আবিষ্কার হয়েছিল, তবে তা কেবলমাত্র পুরুষের প্রয়োজনে নয়। মানুষের কাছাকাছি প্রজাতির অন্য কিছু প্রাণীর জীবনযাপন দেখলে বোঝা যায়— বানর-হনুমানের মতো জীবগুলির এক পুরুষ একপাল নারীকে নিয়ে সংসার চালায়। পুরুষ সন্তান জন্মালে পালের গোদাটি প্রথমেই তাকে হত্যা কবার চেষ্টা করে, পরবর্তী কালের সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা রোধ করার জন্য। আদিমযুগে মানুষের গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও অন্য গোষ্ঠীর পুরুষদের নিকেশ করে মেয়েদের লুঠ করে আনার প্রথা ছিল। এসব থেকে মনে হয় সন্তানের প্রতি মমতা ব্যাপারটি নারীর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি হলেও পুরুষের ক্ষেত্রে তা সভ্যতার মাধ্যমে অর্জিত। সেজন্য বাবার মধ্যে সন্তান-স্নেহের গভীরতা মায়ের থেকে কম হতে বাধ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'স্বাধীন' নারী-পুরুষের উৎপাদিত সন্তানদের অবস্থাটি ভেবে দেখতে হবে। স্বার্থমগ্ন, আত্মকেন্দ্রিক বাবা-মায়ের মধ্যে বড়ো হতে গিয়ে শিশুরাও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বাঁচতেই শেখে।

Single parent শিশুদের অবস্থাটি আবার অন্যরকম। অবিবাহিতা বা বিবাহ-বিচ্ছিন্না মায়ের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে বড়ো হওয়া, আর এরপর নতুন বাবা জুটলে তার কাছে এবং 'নতুন' ভাইবোনেদের সঙ্গে বড়ো হওয়াই এদের ভাগ্যে জোটে । আত্মকেন্দ্রীক বাবা বা মা কি যত্নে আর ভালোবাসায় স্ত্রী বা স্বামীর আগের পক্ষের সন্তানদের বড়ো করে তুলবেন- তা সহজেই অনুমেয়। এর পর একটু বড়ো হলেই বোর্ডিং স্কুলে থাকা আর ধীরে ধীরে চরম আত্মকেন্দ্রীক মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার পর্ব। এইরকম বাচ্চাদের মধ্যে কোনোকিছু Share করে নেওয়ার মানসিকতা জন্মানোর কোনো সুযোগই জোটে না। পরে এরাও শুধু ভোগ করে যাওয়াকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে জেনে বাঁচতে শিখবে আর শেষে মানসিক অবসাদের রোগীদের সংখ্যা বাড়াবে — এটাই স্বাভাবিক।

গণতান্ত্রিক অধিকার

এক: বন্‌ধ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যেই কথায় কথায় বাংলা বন্‌ধ ডাকার একটা প্রবণতা আছে। কখনও পরিবহন ধর্মঘট, কখনও শিল্প ধর্মঘট, কখনও হরতাল, কখনও বা সরাসরি ভারত বন্‌ধ বা বাংলা বন্‌ধের শিরোনাম দিয়ে এগুলি ডাকা হয়। বাস্তবে অবশ্য সবক্ষেত্রে একই জিনিস হয় — বাংলা বন্‌ধ। সরকারের নানান কাজকর্মের সমালোচনা ও বিরোধিতা করা অথবা দাবি আদায়ের জন্য চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে এরকম বন্‌ধ ডাকলে তার তবু একটা মানে পাওয়া যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের রাজ্যে সরকারে ক্ষমতাসীন দলগুলিই এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শক এবং এখনও অন্য সবার চেয়ে বেশি উৎসাহী। যথারীতি সরকারি প্রশাসন-পরিবহন ব্যবস্থার অতি সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিবছর নানা নামের বন্‌ধে বেশ কিছু কর্মদিবস নষ্ট হয়। সরকারি বাবুদের কাছে যদিও বন্‌ধ নামে সবেতন ছুটি (পরের দিন খাতায় সই করলেই চলে), কলকারখানার মালিকদের কাছে বন্‌ধ মানে অকারণ আর্থিক লোকসান, আর ছোটো-বড়ো ব্যবসায়ীদের কাছে তা একদিনের রোজগার নষ্ট হওয়া। ট্রেনে লজেন্স, ডাব বা সেফটিপিন - মানিব্যাগ ফেরি করা হকার বা বাসস্ট্যান্ডের চা বিক্রেতা, মফস্‌সলের সবজি বিক্রেতা চাষিদেরই শুধু নয়, বন্‌ধের দিনে চাষের মাঠে দিনমজুরদের দিনমজুরি করাটাও আজকাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্‌ধের কারণে কত রোগীর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়, কত প্রসূতি হাসপাতালে না যেতে পেরে মারা যান, কত মানুষের একদিনের খাবার জোটা বন্ধ হয়ে যায় — তার খোঁজ কেউ রাখে না। সাধারণ মানুষ মুখে যাই বলুন — মনে মনে কেউই বন্‌ধকে সমর্থন করেন না। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আজকাল যারা বন্‌ধ ডাকেন, তারাও কি সত্যি সত্যি মনে করেন এমন ভাবে নিজেদের রাজ্যটিকে একদিনের জন্য বনধ্‌ করে রেখে কোন আন্তর্জাতিক বা জাতীয় ইস্যুর সমাধানের পথে কিছুমাত্র প্রভাব ফেলা সম্ভব? আর শাসকরা যখন বন্ধ ডাকেন, তখন কাদের বিরোধিতা করেন আর কাদের চাপ দিয়ে কাজ আদায় করতে চান, তা তারাই কেবলমাত্র জানেন। সরকারী, সরকার-বিরোধী —সমস্ত রকম বনধের বড়ো বড়ো ইস্যুর কোনোটাই সাধারণ মানুষের মনে কোনো রকম দাগ ফেলে বলে মনে হয় না। সব বন্‌ধই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ডাকা হয় — আর অন্য সবার কাছে এগুলি অত্যাচার বলে মনে হলেও সমর্থকদের কাছে এগুলি 'বন্‌ধ উৎসব' গোছের এক মজার ব্যাপার।

এই যখন অবস্থা — তখন মাননীয় সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন, একটি প্রস্তাব নিয়ে ভাবলে কেমন হয়? বছরের বিভিন্ন সময় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষতি না করে বছরের কিছু নির্দিষ্ট দিন বন্‌ধ ডাকার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলে কেমন হয়?

মানুষ তাহলে আগে থেকে তৈরি থাকতে পারবে। যেমন ধরা যাক এপ্রিল মাসের এক থেকে পাঁচ তারিখ, অথবা নিদেনপক্ষে প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবার বা এরকম কিছু। এতে আর কিছু না হোক, রাজনৈতিক দলগুলির 'বন্ধ' নামের অত্যাচারের হাত থেকে সাধারণ মানুষ তাহলে বেঁচে যান। গণতান্ত্রিক দেশে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখে কীভাবে পেশি শক্তি দেখিয়ে বন্ধ সফল করার ব্যাপারটি আইনসম্মত হয়ে যায় — তা কেউ বোঝাতে পারবেন কি?

দুই : গণতান্ত্রিক দখল ব্যবস্থা

'মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার' রক্ষা করার জন্য এ বঙ্গদেশে চিরকাল আন্দোলন চলেছে, চলবেও। রেলের জমিতে, রাস্তার ফুটপাথে, খেলার মাঠে, শ্মশানে, কবরখানায় — সর্বত্রই জবরদখল করে বসবাসকারী মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার হয়ে যায় জমির উপর — একসময় এরকম হাজারও মানুষকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে, আর তাই এখন এরকম জবরদখলকারীদের সরিয়ে দেওয়ার মতো 'অগণতান্ত্রিক' সিদ্ধান্ত কেউ নিলে 'রাজনীতি সচেতন' বাঙালিরা রাজনৈতিক নির্দেশমতো 'আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে'। ভাড়া না দিয়ে বা মাসিক দশ-পনেরো টাকা ভাড়া দিয়ে অন্যের বাড়ি দখল করে বাস করা 'গণতান্ত্রিক', আর বাড়িওলার এরকম ভাড়াটেকে ভাড়া বাড়াতে, উঠে যেতে, এমনকি অনেক সময় ভাড়াটের নিজের দ্বিতল বাড়ীতে যেতে বলাটা 'অগণতান্ত্রিক'। এসব ক্ষেত্রে বাড়িওলা হয়ে যান আসামি ; সমস্ত রাজনৈতিক দল, দেশের আইন সবই তার বিপক্ষে। যেদিকে বেশি ভোটার, গণতান্ত্রিক আইনের দাড়িপাল্লা সবসময় সেই দিকেই ঝুঁকে থাকে — ক্ষমতাসীন নেতারাই তো নিজেদের প্রয়োজনে আইন বানান। ভোটতন্ত্র আর গণতন্ত্র এক্ষেত্রে সমার্থক হয়ে যায়।

কোথাও খারাপ রাস্তা, কোথাও নালার উপর সেতুর দাবি, কোথাও বর্ষার জল সরানোর দাবি— এরকম নানান ছোটোখাটো ইস্যু নিয়ে মানুষের আবেগকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ব্যবহার করা হয় চ্যালা -সমর্থকদের গা-গরম রাখার রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে। তাই আগে থেকে কোনো নোটিশ না দিয়ে রেল লাইন বা ব্যস্ত জাতীয় সড়ক অবরোধ করিয়ে নিরীহ সাধারণ মানুষকে অকারণে কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করানোটা এখন সরকারে ক্ষমতাসীন দলগুলিও নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে বলে মনে করে নিয়েছে। এছাড়া দিনে-দুপুরে রাস্তা বন্ধ করে গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক জমায়েত, মিছিল — এসব তো আছেই। রাস্তার ধারের ফুটপাথ ও রাস্তার একাংশ অধিকার করে ইট বালি-চিপস্ ঢেলে রেখে ব্যাবসা করা বা নিজের বাড়িটি দ্বিতীল, ত্রিতল বা বহুতল করার জন্য বাড়ি তৈরির মশলা মাখানোর কর্মটি অন্য কারর অসুবিধার তোয়াক্কা না করে বাড়ির সামনের রাস্তার উপরই করা — এসবও গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। রাত্রে অন্ধকার রাস্তার উপর যেখানে সেখানে সার দিয়ে লরি দাঁড় করিয়ে রেখে ড্রাইভারের নিজের বাড়িতে ঘুমুতে চলে যাওয়া বা ধাবাতে বিশ্রাম নিতে যাওয়া — তাও একই অধিকারের অন্তর্গত। ভোট পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলে এরপর মনে হয় রাস্তায় প্রস্রাব-পায়খানা করাও আইনসিদ্ধ হয়ে যাবে।

তিন: গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও জনাদেশ

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুবই রাজনীতি সচেতন —এরকম একটা প্রচার বঙ্গে ও বঙ্গের বাইরে চালু আছে। রাজনীতি সচেতনতা কাকে বলে, তার স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত — সেসব প্রসঙ্গে আসছি না। কিন্তু সারা গ্রামবাংলার প্রতিটি মানুষকে কোনো না কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সাপোর্টার হিসাবে স্ট্যাম্প লাগানোর এই যে পদ্ধতি, যা গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে চালু — আর এখন শতকরা একশো ভাগ সফল — তাকেই অনভ্যস্ত চোখে রাজনীতি সচেতনতা বলে মনে হয়, আর সেই মতের প্রচার করা হয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ বা রাজস্থানের গো-বলয়ের গ্রামাঞ্চলে মানুষের প্রাথমিক পরিচয় তার জাত আর আমাদের রাজ্যে সেই স্থান নিয়েছে তার রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য। মজার ব্যাপার হল যারা সুদীর্ঘকাল ধরে জাত-পাতের রাজনীতির বিরোধিতা করে এসেছেন— তারাই পশ্চিমবঙ্গে এরকম নবরূপে জাত-পাতভিত্তিক রাজনীতিটি চালু করেছেন — ভবিষ্যতে ইতিহাস একদিন একথা বলবে। জাত-ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার কুফল নিয়ে সারা ভারতের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চিন্তিত— অথচ একচক্ষুবিশিষ্ট হরিণের মতো রাজনৈতিক জাত-পাত নির্ভর যে সামাজিক ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চিরস্থায়ীভাবে চালু করা হল — ভবিষ্যতে এর বিষময় ফল কী হতে পারে — তা নিয়ে ভাবার কথা এনাদের কারওর মনে আসছে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের বর্তমান ভোট ব্যবস্থায় যেমন যাঁরা ভোটে দাঁড়ান, তাদের কাউকে ভোট দিতেই হবে — তাদের কাউকেই যদি কারও পছন্দ না হয়, তার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই — তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও কোনো মানুষের নিরপেক্ষ থাকার কোনো অধিকার বাস্তবে এখানকার শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসন কেউ স্বীকার করে না। প্রত্যেককে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে হবেই — এর অন্যথা হলে নানান ধরনের চাপ আসবে — যাকে সামাল দেওয়া কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। সেজন্য এ রাজ্যের প্রতিটি ছাত্র, প্রতিটি যুবক, প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শ্রমিক-কৃষক সবাইয়ের রং আছে — রং থাকতেই হবে। আর বাংলার গ্রামাঞ্চলে রঙ না মেখে যেমন কেউ বাঁচতে পারবে না — তেমনি রং জানা হয়ে যাওয়ার পর তার রং শাসকদলের অনুকূলে না হলে নানা চাপের মুখে তাকে পড়তে হবেই, যতক্ষণ না তিনি রং বদল করেন। এরাজ্যে 'আমরা' আর 'ওরা' — এটাই হল মানুষ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি।

ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল ভোট রাজনীতির কল্যাণে। পার্টি থেকে (সাম্মানিক) বেতনপ্রাপ্ত ক্যাডার বাহিনীর উপর দায়িত্ব থাকে প্রতিটি গ্রামের, প্রতিটি বুথের ভোটারদের নাম ধরে ধরে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় খাতায় টুকে রাখা। কোনো নির্বাচন এলেই রিপোর্ট তৈরি করে উচ্চতর স্তরেপাঠাতে হয় — নির্দিষ্ট বুথটিতে নিজেদের পক্ষে কতজন, বিপক্ষে কতজন, আর দোদুল্যমানই বা কতোজন। এরপর উচ্চতর স্তরের সঙ্গে গোপন রাজনৈতিক সভায় দোদুল্যমান ভোটারদের প্রত্যেকের সম্পর্কে আলাদা ভাবে আলোচনা করার পর নির্দেশ দেওয়া হয় কার সম্পর্কে কী পদ্ধতি নিতে হবে, সেই ভোটারটি যাতে নিজেদের দিকে আসে।

বিরোধীদের সংখ্যা বেশি হলে সেখান থেকে কাদের ভাঙিয়ে আনা সম্ভব,-কীভাবে ভাঙানো সম্ভব — তা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর পুলিশ— পঞ্চায়েত — প্রশাসন- — এই তিনের উপযুক্ত সহযোগিতায় পরিকল্পনাটি কার্যকর করা হয়। ভোট এগিয়ে এলে এরকম সভা মাসিক, পরে সাপ্তাহিকভাবে হয়। এরকম সভায় বেতনভুক ক্যাডারদের নিজেদের কাজ করতে পারা বা না পারা নিয়ে কৈফিয়ত দিতে হয়।

এরকম সু-শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা হয়তো কোনো একদলীয় রাজত্বের দেশে কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশে তা মানুষের মত-প্রকাশের স্বাধীনতাকে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেয় কেবল। যে দমবন্ধ করা পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব গ্রামে আজ বিরাজ করছে — তার মূলটিও কিন্তু এই রকম বুথভিত্তিক দৃঢ় সংগঠনের কল্যাণে পাওয়া। সারা রাজ্যের সমস্ত বিষয়কে যেখানে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতি—সেখানে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা আলোচনাতেও আসে না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম —মফস্‌সল - শহর— যেখানে যত প্রতিষ্ঠান আছে — সর্বত্র চলছে দখল- রাজনীতি। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন, কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নির্বাচন, কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন — সর্বত্র এই খেলা চলছেই। নামমাত্র একটি 'নির্বাচন' এগুলিতে হয় — যাতে একজন ভোটারেও অধিকার থাকে না নিঃশঙ্ক চিত্তে নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করার। পঞ্চায়েত /পুরসভা / বিধানসভা/লোকসভার সরাসরি রাজনৈতিক নির্বাচনগুলিতেও একই ব্যাপার চলে। রিগিং মানেই যে সবসময়ই বোমা, গুলি, বুথজ্যামের মতো 'কর্কশ' ব্যাপার হবে, এ ধারণা ভুল। ভোটার লিস্ট তৈরি করা থেকে ভোট-গণনা — স্তরগুলির কোনোটিরই রিগিং পরিকল্পনা বুদ্ধিমান মানুষের বুদ্ধির ছোঁয়া থেকে আজকাল বঞ্চিত থাকে না।

এতসবের মধ্যে প্রক্সিভোটের ব্যাপারটি কিন্তু একইরকম ভাবে বহুদিন থেকেই চালু আছে। আমাদের ছাত্রজীবনে আশির দশকেও আমাদের কিছু সহপাঠী কর্পোরেশন নির্বাচন বা অন্য কোনো নির্বচনের দিন সন্ধে নাগাদ হোস্টেলে ফিরে এসে গর্ব করে কে কয়টি ছাপ্পা মেরে এসেছে তার হিসেব দিত। এরকম হিসাবে এক একজন চল্লিশ ও পঞ্চাশটি করে ভোট দিয়ে আসত। এখন অবশ্য টিভির পর্দায় বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্বরা এসে বলছেন তারা ভোট দিতে পারেননি — তাই এসব ব্যাপার 'গণতান্ত্রিক নির্বচনের' অঙ্গ বলেই সাধারণ মানুষ সম্ভবত : মেনে নিয়েছেন। Violation of democratic rights- সংক্রান্ত কোনো আইন চালু থাকলে রাজনৈতিক নেতাদের অনেককেই জেলের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করতে হত।

কিছুটা অন্য রকম দৃষ্টিতে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিচার করে এ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তোলা যাক। আমাদের দেশের কতজন মানুষের নাম ভোটার তালিকায় কোনদিনই ওঠে না, কতজন মানুষ কোনদিনই ভোট দেন না, তাদের মধ্যে কতজনের ভোট 'পড়ে' যায়, কোনো একটি নির্বাচনে পড়া ভোটগুলির শতকরা কতগুলি ভোটার কর্তৃক দেওয়া এবং কতগুলি ভোটার বাদে অন্য কার দিয়ে দেওয়া — এসব খবর বের করানো কি অসম্ভব?

বিতর্কিত বুথে ভোটের দিন সন্ধ্যায় ভোটের তালিকা ও জন-গণনার তালিকা ধরে ধরে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের হাতের কালি পরীক্ষা করলে এরকম সমীক্ষা সহজেই করা যায় (অবশ্য পূর্ব প্রস্তুতির সুযোগ দিয়ে যাওয়া চলবে না)। অন্যান্য অনেক দেশে তো এর চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও 'অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা' আমাদের সামনে-নানা নতুন খবর বের করে আনে, যেগুলি জেনে অনেকসময় চমকে উঠতে হয়। তাহলে এদেশে এসব হয় না কেন? নাকি নিন্দুকেরা যা বলে তাই ঠিক— কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কি বেরিয়ে আসবে সেই ভয়ে ভোটলুণ্ঠনকারী রাজনৈতিক দলগুলি মিডিয়াগুলিকে উপযুক্ত যৌতুক উপহার দিয়ে আগে থেকেই কিনে রাখে!

ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বলে নির্বাচন ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। ভোট লুঠ বা রিগিং মেশিনারির নানা সূক্ষ্ম ব্যবহারের কথা বাদই দেওয়া যাক, এমনকি বঙ্গীয় নির্বাচনের কোনো কোনো জায়গায় শতকরা একশো ভাগ (কোথাও আবার তারও বেশি!) ভোট পড়ার কথাও না হয় আলোচনায় আনলাম না, তবুও এই ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু মারাত্মক প্রশ্ন থেকেই যায়। সাধারণভাবে আমাদের দেশের বিভিন্ন নির্বাচনে গড়ে ৫০ - ৬০ শতাংশ ভোট পড়ে। জয়ী দল এই ভোটের ৪০ - ৪৫ শতাংশ পায়। অর্থাৎ মোট ভোটারের মাত্র ২০-২৫ শতাংশ ভোট পেয়েই একজন নির্বাচিত হন। সহজ হিসাবে প্রতি পাঁচজন ভোটারের একজনের সমর্থন পেয়ে একজন প্রার্থী বা দল কীভাবে 'জনাদেশে' নিজেকে 'জয়ী' বলে দাবি করেন? স্কুলের পরীক্ষায় পাস করতে হলেও শতকরা ৩৪ ভাগ নাম্বার পেতে হয়! এ কেমন প্রতিনিধিমূলক নির্বাচন? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কী বলেন?

—

সরকারি কর্মচারী

এক : ফাঁকি দেওয়ার আর ঘুষ নেওয়ার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ইংরেজ আমলের ঢেউ গোনার কাজে লাগানো দারোগার গল্পে সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ খাওয়ার নানা বিচিত্র উপায় উদ্ভাবনার মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতার যে পরিচয় মেলে, তা যোগ্য উত্তরসুরিদের মাধ্যমে এখন অনেক বেশি প্রসারিত, পরিপক্ক ও সংঘবদ্ধ। এখনকার বাজার অর্থনীতির হিসাবে সবকিছুই পণ্য; সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় মূল্য আছে, যা দিতে পারলে সেগুলি কেনা-বেচা করা যায়। নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ — এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোই বা এর বাইরে থাকবে কেন? সেজন্য এখন সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি এমনভাবে তৈরি হয়ে গেছে, যে শুধু দু-একটা পচা ক্ষতে ঔষধ লাগিয়ে সারানোর চেষ্টা করে কোনো লাভই হবে না। আর সম্পূর্ণ ব্যাপারটি সঠিকভাবে না বুঝে এ রোগের দাওয়াই খোঁজার চেষ্টাটাই অর্থহীন।

সরকারি চাকুরির বিভিন্ন ক্ষেত্রে— বিশেষত: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে যেখানে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়— হাজার জাল-জুয়াচুরি স্বত্ত্বেও কিছু ভালো ছেলে সেই চাকুরিগুলিতে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। এদের অনেকের মনেই চাকুরিতে জয়েন করার আগের রাত পর্যন্ত ভালো কিছু করার সদিচ্ছা থাকে, কিন্তু এই সদিচ্ছার উপর প্রথমেই লাগাম পরানো হয় কর্মচারীটি চাকুরিতে ঢোকার পরপরই কয়েকজন বয়স্ক দাদার দ্বারা ঘেরাও হয়ে গিয়ে কর্মচারী সংগঠনের সদস্যপদ নিতে বাধ্য করার মাধ্যমে। যে মানুষটি একদিনও চাকুরি করল না, চাকুরি কি জিনিস তাই বুঝল না, নিজের কাজটুকু কী — তাও জানল না, কোনোকিছু জানা - বোঝার আগেই তাকে কর্মচারী সংগঠনের সদস্য হতে বাধ্য হতে হল। এরপরই যথারীতি দৈনন্দিন ট্রেনিং শুরু হয় 'সংগঠনের' চোখ দিয়ে নবীন কর্মচারীটিকে সবকিছু বিচার করতে শেখানোর। সংগঠন যেটিকে ঠিক বলে - সেটি ঠিক, আর যাকে ভুল বলে, তাই ভুল। নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত কেউ কেউ প্রথমদিকে অন্য কথা বলার চেষ্টা করলে তাকে থামিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব হয় না। এরপর নবীন কর্মচারীটিকে সংগঠনের ঘরে নিয়ে গিয়ে সংগঠনের ছুটছাট দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া, যে-কোনো মিছিল-মিটিংয়ে সামনের সারিতে থাকতে বাধ্য করা— এরকম নানা রকম ট্রেনিং সিডিউল তৈরি করা আছে।

অন্যদিকে, প্রথম দিন থেকেই সহকর্মী 'নেতা' মারফতনবীন কর্মচারীটিকে কাজকর্ম শেখা ও কাজ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করা হয়। এরপরও কেউ শেখা-জানার চেষ্টা করতে গেলে শুরু হয় ঘুরিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা। এরপর সংগঠনের স্বার্থে কিছু কিছু অন্যায় কাজ এদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়, যাতে আস্তে আস্তে এদের সংগঠন নির্ভরতা বাড়ে। এভাবে নানা রকম চাপে থাকা কর্মচারী অবচেতন মনের সামনে দুটো খোলা রাস্তা পায় —

হয় সংগঠনের অন্য সদস্যদের মতো স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলে নিরুপদ্রবে দিন কাটানো, আর নয়তো কাজ করতে গিয়ে নানা ঝামেলার মধ্যে জড়ানো। স্বভাবতই, অধিকাংশ কর্মচারীই ঝামেলায় না জড়িয়ে স্রোতে গা ভাসানোর রাস্তাটিকেই বেছে নেন, ফলে কাজকর্ম শেখার ও করার মানসিকতাটি খুব তাড়াতাড়িই হারিয়ে ফেলেন।

কাজ করতে হোক বা না হোক, অফিসের হাজিরা খাতায় সই করলেই মাস-মাহিনাটি পাওয়া যায়— আর প্রোমোশন তো কাজ দেখে হয় না — যান্ত্রিক নিয়মে বা নেতাদের তৈলমর্দন করে সংগঠনের নির্দেশ লাভ করতে পারলে হয়। তাই সংগঠনের নেতা বা চ্যালাদের চটিয়ে কে আর কাজ করতে চায়? রাজনীতির টিকে নিয়ে এভাবে সংগঠনের মেম্বার হয়ে সংগঠনের চাঁদা নিয়মমাফিক মিটিয়ে দিলে আর নেতাদের তৈলমর্দন করে যেতে পারলেই সাত খুন মাপ — সেজন্য নিয়মিত অফিস করা, কাজ করার হাঙ্গামা পোয়ানোর উৎসাহ থাকে না প্রায় কারওরই। এছাড়া কাজ করতে গেলে টুকটাক ভুলচুক হতে পারে, সেগুলিকে আবার ঠিক করতে হবে, কাজি লোককে নিরুপায় উপরওয়ালারা আরও বেশি করে কাজ গছিয়ে দেবেন — এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকলে মিটিং-মিছিল-জমায়েত-পথসভা— 'গেট' সভা — এসবে সময় মতো সবসময় যোগ দেওয়া যাবে না, ফলে নেতাদের চটানোর ঝুঁকিও থেকে যাবে। তা ছাড়া বুঝেই হোক বা না বুঝেই হোক — দুর্নীতির রাস্তায় কোনোভাবেই একবার হাঁটা শুরু করলে আর ফেরার রাস্তা থাকে না, শুধু এগিয়ে চলতেই হয়। সেজন্য ফাঁকিবাজি এবং উপরি আয়কে নিজেদের অর্জিত অধিকার ভেবে নিয়ে যে সংখ্যাগুরু কর্মচারীবৃন্দ আলস্যে গা ভাসান এবং কাজ করতে গেলেই ঘুষ চান (অথবা বলা ভালো ঘুষ না পেলে কাজ করতে চান না) — তাদের শত্রুতার মুখে পড়ে তাদের 'পরামর্শে' চালিত রাজনীতির উচ্চতর স্তরের নেতাদের দ্বারা তৈরি করা নানা রকম ঝুট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে কর্মচারীদের দূরে থাকতে চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

দুই: বেয়াড়া কর্মচারীকে সিধে করার চরম অস্ত্র — ট্রান্সফার

যে অতি অল্প সংখ্যক মানুষ এখনও সরকারি অফিসগুলোতে নিয়মিত আসেন, কাজ করতে চান, কাজ করেন; এবং সেই কারণে সংগঠনকে জীবনের পরম আশ্রয় বলে মনে করেন না, তারা সহকর্মীদের ও নেতাদের চোখে 'বেয়াড়া কর্মচারী'। এই মানুষগুলির চরিত্র এমনই যে হাজার চেষ্টা করলেও এরা দু-নম্বরি রাস্তায় হাঁটতে পারেন না। সমগ্র কর্মচারী সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশের এই কর্মচারীরা সবই জানেন-বোঝেন —তবু কোনো কারণেই নিজেদের নীতিবোধ আর কর্তব্যবোধ থেকে এক চুলও নড়েন না। এদের জন্যই সরকারি দপ্তরগুলো এখনও চলছে, পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়েনি। অথচ বিনিময়ে সারাজীবন দুর্গতি ভোগ করে যাওয়াই যেন এনাদের ভবিতব্য। সাধারণ মানুষ অফিসে গিয়ে ফাঁকিবাজদের দেখা সাধারণত: পান না — অধিকাংশ সময় এদেরই গালমন্দ করার জন্য হাতের কাছে পেয়ে যান। বেয়াড়া সরকারী কর্মচারী — তা সে সাধারণ তৃতীয় শ্রেণির করণিকই হোন বা অন্য স্তরের বেতন পাওয়া কর্মচারীই হোন - সবাইয়ের জন্যই নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি আছে 'সিজিন্ড্' করার জন্য, প্রয়োজন মতো সেগুলি ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি সরকারি অফিসে

সরকারি চিঠির ইসু নাম্বার ফেলার যে খাতা থাকে, তাতে দু-চার দিন পর পর দু-চারটি করে ফাঁকা নাম্বার এমনি এমনি ফেলা থাকে, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন মতো পুরানো দিনের নাম্বারে নকল চিঠি তৈরি করা যায়। ঘুষ খাওয়া আর দু-নাম্বারি কাজ করার জন্য এই পদ্ধতিটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়, তবে বেয়াড়া কর্মচারীকে ফাঁসানো অথবা ফাঁসাতে গিয়ে কোনো সমস্যা হলে তা থেকে বেড়িয়ে আসার জন্যও পদ্ধতিটি খুবই কাজে লাগে। এছাড়া দিনের পর দিন মানসিকভাবে তীব্র অশান্তিতে রাখার জন্য ফাইল সংক্রান্ত ব্যাপারে নানা কারচুপি করা, সামান্য ভুল-চুক নিয়ে উচ্চস্তরের (সমধর্মী) অফিসারকে দিয়ে শো কজ করানো, একটু উঁচু স্তরের কর্মচারীকে 'টাইট' করতে হলে নিজেরাই কাগজপত্রে গণ্ডগোল করে রেখে পরে রাজনৈতিক লাইন করে ভিজিল্যান্স লাগানো, সকাল থেকে সন্ধে অবধি প্রস্রাব-পায়খানা বন্ধ করে দিয়ে আর ফোনের লাইন কেটে দিয়ে দিনের পর দিন অপ্রাসঙ্গিক সব বিষয় নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়ার নামে চরম মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালানো — এসব অস্ত্রে প্রায় সবক্ষেত্রেই কাজ হয়ে যায়। গল্পকথা নয় — পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি ব্লকের এক তরুণ বিডিয়ো এরকম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলেন। এসব করেও যদি কর্মচারীকে ঠিকমতো শায়েস্তা না করা যায়, তাহলে তার জন্য ট্রান্স্ফার নামের মারণাস্ত্রটি ব্যবহার করা হয়।

Transfer Policy বলে খাতায় - কলমে যাই লেখা থাক (আদৌ কিছু আছে কি?), বাস্তবে আমাদের রাজ্যে এই পলিসির নামে যে অলিখিত নিয়মটি মেনে চলা হয়, তা হল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা, চ্যালা এবং তস্য চ্যালাদের স্ট্যাম্প সিল হতে না চাওয়া, নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা মাফিক কাজ করতে চাওয়া 'অবাধ্য কর্মচারী'দের জন্য ব্যবহার্য এটি একটি Punishment Policy। নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা এভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে অর্থাভাবের কারণে আর সাহায্যকারীর অভাবে আইন-আদালতের কাছে যেতে পারেন না — আর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আবার এ নিয়ে আদালতে যাওয়ার কোনো আইনগত অধিকারই রাখা হয়নি।

রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই তৈরি হয় এবং পরিচালিত হয় সমস্ত সরকারি কর্মচারী সংগঠন। স্বভাবতই রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠন ধরে রাখা, ইলেকশান মেশিনারিকে কর্মক্ষম রাখা — এসব নানান কারণে রাজনৈতিক নেতাদের প্রয়োজন হয় বশংবদ কর্মচারী সংগঠন নেত্রী বৃন্দের। নিজস্ব চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা এবং সামান্যতম হলেও নীতিবোধ আছে এমন কোনো ব্যক্তি নেতৃবৃন্দের মধ্যে এসে গেলে প্রয়োজনে ইচ্ছামতো তাদের ব্যবহার করা যায় না। সেজন্য রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ই স্থির করে দেন পেটোয়া কর্মচারী সংগঠনগুলির নেতৃত্বের পদে কারা কারা থাকবেন। সেইমতো নেতাদের দল (প্যানেল) আগে থেকে ঠিক করে নেওয়ার পর কর্মচারী সংগঠনগুলির আমৃত্যু নেতৃত্ব দেওয়ার ঠিকাদারি নেওয়া নেতাদের 'ভোটাভুটি ছাড়াই নির্বাচিত' (বিনা বিরোধে ও সহমতে নির্বাচিত) করা হয় প্যানেল পাস করানোর মধ্য দিয়ে। নির্বাচনের ভোটারগুলি কেমন? সাধারণ মেম্বারদের তো ভোটাধিকার থাকে না — কয়েকজন সাধারণ মেম্বারের

হয়ে একজন ভোট দিতে যান — সেই ভোটার কর্মচারীটিও আবার সংগঠনের নেতৃত্বের দ্বারা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। এর নাম 'গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন'। তাই দেখা যায় এইসব সংগঠনগুলির এবারের সাধারণ সম্পাদক পরেরবারের সভাপতি, এবারের সহ - সম্পাদক পরের বারের ক্যাশিয়ার। এরকম একটা ব্যবস্থা চিরকাল চালু রাখার জন্য সমস্ত কর্মচারীকে তাদের নেতাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা জরুরি। এই কারণে ট্রান্স্ফারের ভয় ফাঁসির দড়ির মতো সব সময় সামনে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। সেজন্য যারা 'অবাধ্য' অথবা অন্য কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত — তাদের বিরুদ্ধেই কেবল ট্রান্স্ফার পলিসি প্রযোজ্য হয়। কোচবিহার জেলার মানুষকে পশ্চিম মেদিনীপুরে বা পুরুলিয়ার মানুষকে কোচবিহারে ট্রান্স্ফার করা হয় 'শিক্ষা' দেওয়ার জন্য। নিজেরাই নিজেদের (কায়দা করে) নির্বাচিত করে নেওয়া কর্মচারী সংগঠনগুলির রাজ্যস্তরের নেতারা সবসময়ই কলিকাতার আর জেলাস্তরের নেতারা জেলা সদরের অফিসগুলি আলো করে সারাজীবন শুধুমাত্র একই অফিসের এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে 'টেবিল ট্রান্স্ফার' নিয়ে দেশোদ্ধারের কাজকর্ম করে বেড়ান। কোনো স্তরের কোনো কর্মচারী সত্যিকারের কিছু কাজ করতে গিয়ে সংগঠনের মতের বাইরে গেলেই তার 'শিক্ষা' পাওয়ার জন্য ট্রান্স্ফার হওয়া অনিবার্য, অথচ, নেতাদের সারাজীবন টেবিল ট্রানস্ফার ছাড়া অন্য কোনো ধরনের ট্রান্স্ফার হওয়ার কথাটুকু ভাবার সাহসই এ রাজ্যে কারওর নেই। সরকার বাহাদুরও সম্ভবত: মনে করেন নেতাদের চাকুরির শর্ত ও নিয়মকানুন সমস্তরের অন্য কর্মচারীদের থেকে আলাদা। আর কাজ? এ রাজ্যে কী সরকারী অফিসে, কী কল - কারখানায় —সর্বত্রই নেতারা নেতাগিরি করার জন্য মাইনে পান — ওনাদের কাজ করার কোনো প্রয়োজন হয় না।

স্রোতের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিতে অক্ষম যে কর্মচারীটিকে সংসার-পরিবার-দায়িত্ব—সব ফেলে বাড়ি থেকে পাঁচ-সাতশো কিলোমিটার দূরে থাকতে বাধ্য হতে হয় —তার কীরকম কাজ করার উৎসাহ আর অবশিস্ট থাকতে পারে, তা বোঝার জন্য কোনো বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, বোধের অবশ্য প্রয়োজন হতে পারে। তাই যা হওয়ার তাই হয়, হচ্ছেও। যতই নেতা - মন্ত্রীরা 'ডু ইট নাও' বলে জনসমক্ষে চিৎকার করুন না কেন, সরকার আদৌ এ রাজ্যে কাজকর্ম হোক বলে চায় — একথা তার কর্মচারীরা অন্তত: মনে মনে বিশ্বাস করে না।

তিন: ডেলি পাষণ্ড সমাচার

যেসব সরকারি কর্মচারীদের সারাদিনে একবার অফিসে ঢোকার সময় ও একবার অফিস ছাড়ার আগে হাজিরা খাতায় সই করতে হয় (মাঝের সময়টা যেখানেই থাকুন না কেন), তারা, কিছু বেসরকারি কর্মচারী এবং কিছু ছোটো -ব্যাবসাদার — যাদের সবাইকে মফস্সল থেকে শহরে প্রায় প্রতিদিন যেতে-আসতে হয়, তারা সবাই মিলে তৈরি করেছেন এক বাহিনী— ডেলি প্যাসেঞ্জার (পাষণ্ড) বাহিনী। লোকাল ট্রেনের প্রায় সব সিটই ট্রেন যে স্টেশন থেকে চালু হয় সেই স্টেশনের কারশেড বা স্টেশনের বাইরের আউটার থেকেই পরিচিত হকারদের সাহায্যে 'রিজার্ভ' হয়ে যায়; পুরানো তাস, খবরের কাগজের টুকরো, এমনকি দিয়াশালাই

কাঠি দিয়ে। ট্রেন ছাড়ার আধঘন্টা আগে স্টেশনে পৌঁছেও তাই কেউ বসার জায়গা পান না, ফাঁকা সিটের সামনেই দাড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন। ট্রেন ছাড়ার কয়েকমুহূর্ত আগে দু-একজন প্রতিটি কোচে এসে ওঠেন, আর তারপর বিভিন্ন স্টেশন থেকে ওনাদের পরিচিত সহযাত্রীরা এসে 'রিজার্ভ' করা সিটগুলি ভরান। এরপর হাঁটুর উপর সরকারি অফিস থেকে ম্যানেজ করা তোয়ালেটি পেতে ওনারা শুরু করেন তাস খেলা। কেউ কেউ আবার লাগান টানা ভাতঘুম। সাধারণ যাত্রীদের এসব দেখে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। কিছু বলতে গেলেই সংঘবদ্ধ শক্তির কাছে মারধোর খেতে হবে— অপমানিত হতে হবে। ট্রেনের টিকিট চেকার তো আজকাল কদাচিতদৃশ্য জীব, তারা দৈবাত কামরাতে এলেও এনাদের ঘাঁটান না। একে তো চেনামুখ সব— তার উপর সংঘবদ্ধ শক্তি কী জিনিস তা এনারা ভালোভাবেই জানেন। আর টিকিট? কৃষ্ণনগর, বনগাঁ, খড়গপুর বা ডায়মন্ডহারবার থেকে প্রতিদিন কলিকাতা আসা-যাওয়া করেন এমন মানুষের মান্থলি টিকিট কাটা থাকে দমদম, সাঁতরাগাছি বা যাদবপুর থেকে; নেহাত প্রতিদিন হাওড়া— শেয়ালদার গেটটা পেরোতে হয় — তাই মাসে বিশ-পঁচিশ টাকার বাজে খরচ মেনে নিতে হয়। এদের একাংশ আবার এটুকুও করেন না —সারাবছর বিনা টিকিটে ট্রেনে যাতায়াত করেন। সমস্ত স্টেশনের মেন গেটকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে গলিঘুজির মধ্যে দিয়ে স্টেশনের বাইরে যাওয়া যায়—তা এনাদের মুখস্ত। কর্তৃপক্ষ এসব জানেন না? সবই জানেন। পূর্বরেলে কর্মরত এক পরিচিত কর্মীর কথায় বনগাঁ লাইন, কৃষ্ণনগর লাইন আর দক্ষিণ-শিয়ালদা লাইনে যে সংখ্যার মানুষ প্রতিদিন ট্রেনে চড়েন, তাদের অর্ধেকেরও বেশি বিনা টিকিটের যাত্রী। যারা টিকিট কাটেন—তাদেরও একটা বড়ো অংশের সেই দমদম-সাঁতরাগাছি কেস। যারা নিত্যযাত্রী নন, কাজেকর্মে কলিকাতায় আসেন — তারাই সাধারণত টিকিট কাটেন আর অধিকাংশ সময়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেলযাত্রা করতে বাধ্য হন।

চার : নিজের লোক বনাম কাজের লোক

হাজার চাপ, হাজার অত্যাচার, দু-নম্বরির স্রোতে গা-ভাসানোর হাজার হাতছানি — তবু এরই মাঝে যে ক্ষুদ্র একটি শ্রেণির কর্মচারী এখনও দুর্নীতিগ্রস্থ হননি (হতে পারেননি বলা ভালো)— তাদের শুধু চাকুরিজীবন নয় — ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনও অভিশপ্ত হয়ে যায়। সততা নিয়ে বাঁচতে চাওয়া মানুষের সংসার জীবনের সঙ্গিনীরাও একইরকম মানসিকতার হবেন, — তা আশা করা যায় কেবল — যদিও এটা কোনো বাস্তবসম্মত চিন্তা নয়। ভোগবাদকে জীবনের চরম লক্ষ্য বানিয়ে বেঁচে থাকা মানুষদের মধ্যেই পড়েন এসব মানুষের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও পরিজনরা। উপরি রোজগার না থাকায় এসব মানুষের সংসার জীবন হয় বিবর্ণ। নিত্যদিন সহকর্মীদের 'উপরি' নির্ভর স্ট্যাটাসের সঙ্গে তুলনা করে কাপুরুষতার বদনাম শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে হীনম্মণ্যতায় ভুগতে থাকা হয়ে দাঁড়ায় এদের নিয়তি। যখন-তখন সেখানে-সেখানে ট্রানস্ফার হওয়া, সামাজিক-সাংসারিক অসম্মান — এসবের মধ্যে থেকে চরম যন্ত্রণা ভোগ করেও এরা অন্যদের মতো হতে পারেন না। যে নীতিবোধ

শত নির্যাতনেও মানুষের মেরুদণ্ডকে সোজা রাখে — সেরকম নীতিবোধের শিক্ষা পাওয়া মানুষও আজকাল নুতন প্রজন্মের মধ্যে নিতান্ত অমিল — সেজন্য সামান্য সান্ত্বনটুকুও এদের দেওয়ার কেউ নেই। যুগ বদলে গেছে — আশা করা যায় এই বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি খুব শিগগিরই পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যাবে।

যেসব মানুষ শহরে এক সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে বসবাস করেন, আর সাজানো ড্রয়িংরুমের মধ্যে বসে চিন্তাভাবনা করেন — তাঁদের একাংশের প্রশ্নগুলি এরকম — 'যত চাপই আসুক, কর্মচারীরা নিজের কর্তব্য থেকে সরবেন কেন', 'যেখানেই ট্রান্সফার হোন, সেখানেও তো কাউকে না কাউকে যেতে হত', 'ট্রানস্ফার হতে পারে জেনেই তো চাকুরিতে ঢুকেছিলেন', অথবা "সরকার তো কর্মচারীদের ঘরভাড়া ভাতা দেন, ঘরভাড়া করে সবাইকে নিয়ে গিয়ে থাকলেই হল" — ইত্যাদি। বক্তা ও শ্রোতারা ভুলে যান যে, যে নিয়ম সবাইকে মেনে চলতে হয়, মানুষ তা সহজেই মেনে নেয় — অবিচার বলে মনে করেন না। কিন্তু যখন দিনের পর দিন তা শুধুমাত্র একজনের উপরই কেবল অত্যাচার হয়ে নেমে আসতে থাকে — তখন একজন মানুষের মনের মধ্যে যে প্রবল চাপের উদ্ভব হয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয় সংসার আর সমাজের নানান চাপ — যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নীতিবোধের মেরুদণ্ডটিকে ভেঙে দিতে সক্ষম হয়। মানুষের সহ্য করার ক্ষমতা অসীম নয়, তারও একটা সীমা আছে। কোনো সংসারী মানুষই নিজের সন্তান, স্ত্রী, বৃদ্ধ বাবা-মা —এদের সবাইয়ের সব সমস্যাকে সবসময় গুরুত্বহীন ভেবে নিয়ে শুধু কাজ করার উৎসাহেই কাজ করে যেতে পারেন না।

কর্মহীনতার যে চল অচলায়তন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যদি সরকারি কর্তাব্যক্তিদের সেটিকে একটু সরিয়ে সামান্যতম কাজকর্ম করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে সবার আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাকে তাঁরা উৎসাহ দেবেন — কাজের মানুষকে, নাকি নিজের লোককে। নিজের লোক কখনওই কাজের লোক হবে না, আর কাজের লোক কখনওই কারও আজ্ঞাবহ দাস হবে না। সুতরাং নিজের লোক আর কাজের লোক — এই দুইয়ের যে কোনো একটিকেই কেবলমাত্র বেছে নিতে হয় — আর পশ্চিমবঙ্গে সবক্ষেত্রেই প্রথমটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, হচ্ছে। যতদিন এই প্রথা চালু থাকবে— ততদিন গুরুগম্ভীর আদর্শের কথা বলে সত্যিকারের কোনো লাভ হবে না — বাগাড়ম্বরই সার হবে।

—

চূড়ান্ত ভণ্ডামির কথকতা

এক : জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর মূর্খ ভোটার বৃদ্ধি যখন সমর্থক

"তেত্রিশ কোটি মোরা, নহি কভু ক্ষীণ
হতে পারি দীন, তবু নহি মোর হীন"

... অতুলপ্রসাদ সেন।

আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেল ৫৮ বছর। ইংরেজ শাসনে থাকা 'ইন্ডিয়া' এখন হয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। তিন দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫০ কোটির কাছাকাছি। জনপ্রিয়তা যতটাই থাকুক, বিজ্ঞানের প্রবন্ধের মতো অতুলপ্রসাদের এই গানেরও জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এত তাড়াতাড়ি বদলে গেছে — যে তার এখুনি বদল করা দরকার। গানে তো আর হাত দেওয়া যাবে না —তার বদলে দ্রুত বেড়ে চলা জনসংখ্যা ব্যাপারটি নিয়ে অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষে সমস্যার অন্ত নেই। এদেশে অতি দ্রুত হারে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, সেজন্য বেড়েই চলেছে বাসস্থান আর খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে জমির প্রয়োজন। এদিকে বন-জঙ্গল ধ্বংস করেও আর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ছে না, কৃষির উৎপাদন হার বাড়তে বাড়তে এখন আবার কমতে শুরু করেছে। সব মানুষের কাছে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পৌঁছে না, সব জায়গায় মানুষ পরিশ্রুত পানীয় জলটুকু খেতে পায় না, অনেক মানুষের বছরের দীর্ঘ সময় কোনো কাজ জোটে না; মাথার উপর আকাশ নিয়ে রাত্রিযাপন করতে বাধ্য হন অনেক মানুষ— এরকম অজস্র সমস্যার কথা সারা পৃথিবীর মানুষ জানেন। বিশ্বব্যাংক বা এশীয় ব্যাংক থেকে এইসব মানুষের অবস্থার উন্নতি করার লক্ষ্যে ঋণ নেওয়া, নানা বিদেশি সংস্থা এবং বিশ্ব-সংস্থা থেকে একই উদ্দেশ্যে অনুদান ও ঋণ নেওয়া — এসব চলছে, চলবেও; কিন্তু এ দেশের আসল সমস্যাটির কথা সবাই জেনেও মুখ ঘুরিয়ে রাখেন অন্যদিকে। খুব সহজ কথায় যদি বলা যায় যে পূর্ব ও পশ্চিম-দুই জার্মানি মিলিয়ে যত মানুষ বাস করেন, ঝাড়খণ্ডহীন বিহারের জনসংখ্যাও তার চেয়ে বেশি; কিংবা পাহাড়-টিলা-অরণ্যময় মধ্যপ্রদেশ রাজ্যটির বর্তমান জনসংখ্যা ফ্রান্স দেশটির সমান —-তাতেও বোধহয় সমস্যার স্বরূপ সবটা ধরা পড়ে না। অথচ স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে, সচেতনতা বাড়িয়ে জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে জন্ম নিয়ন্ত্রণে মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার 'হাম দো, হামারা দো' শ্লোগান, নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার নানা প্রকল্প চালু করা, তপশিলি-জাতি-উপজাতিদের সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে দশ বছর মেয়াদি চাকুরিতে সংরক্ষননীতি (এখন ও.বি.সি. সহ

চিরস্থায়ী সংরক্ষণে যা পরিণত), সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ বরাদ্দ - ইত্যাদি। কাজের কাজ কি হয়েছে? জেনেবুঝেও খরগোশের মতো বালিতে মুখ লুকিয়ে রাখার মতো করে চালানো ভণ্ডামি চলল প্রায় ছয় দশক। এখনও আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের সৎ হওয়ার চেষ্টা শুরু হবে না? আয়নার সামনে একবার নিজেদের উলঙ্গ করে দেখে নিলে কেমন হয়?

ভোট-রাজনীতির কল্যাণে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে পরোক্ষে উৎসাহ দিয়ে যাওয়া হয়েছে চিরদিন। যত বেশি জনসংখ্যাবৃদ্ধি — তত বেশি দারিদ্র্য — তত অশিক্ষা — আর ততই মস্তিষ্কহীন ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধি। এই সমীকরণকে উৎসাহ দান করা হয়েছে চিরকাল।

সন্তানের জন্ম কোনো পরিকল্পনা নয় — কেবল কামের ফসল — তাই কোনো ভাবনা-চিন্তা না করে মাত্রাতিরিক্ত হারে বংশবৃদ্ধিকরতে অভ্যস্ত, সহায় সম্বলহীন, অশিক্ষিত, ধর্মভীরু, গ্রামজীবনের নানান কুসংস্কারে ভরা মানুষজনকে গাধার সামনে গাজর ঝোলানোর মতো করে বোঝানো হয়েছে 'কোটা প্রথার' বা 'ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার' মতো নানা রঙের টোপগুলিই তাদের দারিদ্র্যতা থেকে উদ্ধার করতে পারে, তাদের জাত-কুল -সম্মান রক্ষা করতে পারে। মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মের নামে যে কোন ব্যাপার বিশ্বাস করার জন্য উৎগ্রীব মানুষজনকে উসকে দিয়ে ভোটবাক্স বোঝাই করার খেলা চলেছে এতকাল। কখনও, কোনোদিনই চেষ্টা করা হয়নি অত্যধিক বংশবৃদ্ধিই যে দরিদ্র মানুষের হতদরিদ্র হওয়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ— সে কথাটি বোঝানোর। কেউবা কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ করে জবরদস্তি করতে গেছেন— তার ফলে অন্যেরা তার বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে দিয়ে ভোটের বাক্স বোঝাই করেছেন। জনসংখ্যাবৃদ্ধি সংক্রান্ত আসল কারণগুলি আমাদের দেশের সচেতন মানুষ এবং বিদেশিদের চোখের আড়ালে গোপন করে রাখার চেষ্টায় চালু করা হয়েছে নানান সেন্সর— যাতে জনগণনা বা অন্য কোনো ধরনের সরকারি -বেসরকারি অনুসন্ধানে প্রকাশ না পায় কোনো ধরনের জনগোষ্ঠী, কোনো আর্থিক অবস্থার বা কোনো স্তরের শিক্ষা পাওয়া জনসাধারণের মধ্যে বংশবৃদ্ধির হার অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। এই ধরনের পরিসংখ্যান জানা থাকলে তারপর হয়তো এর পেছনের কারণগুলি অনুসন্ধান করা যেত — আর তারপর সেই কারণগুলি দূর করার ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারতো। তা না করে চিরকাল সবকিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, আর মানুষ বুঝে গেছে এদেশে সবারই সব কিছু করার স্বাধীনতা আছে। সমস্ত শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি টাকার অভাবে — অথচ ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার নামে কচিকাঁচা বয়স থেকেই ধর্মান্ধতার শিক্ষা দেওয়ার মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনার পাঠ নেওয়াকে 'শিক্ষা' বলে মেনে নেওয়া হয়েছে —আর সেজন্য সরকারি কোশাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচও করা হচ্ছে। এদিকে বংশ পরম্পরায় এক সুবিধাভোগী শ্রেণিকে সরকারি আনুকূল্য দান করার জন্য চালু রাখা হয়েছে চিরস্থায়ী কোটা ব্যবস্থা, যা কেবল কোয়ানটিটির উপর নির্ভরশীল, কোয়ালিটির ব্যাপারে চুপ করে থাকে। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে সব মানুষের সমান অধিকার

অন্তত : কাগজে কলমে স্বীকৃত — সেখানে বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিগত আইন (মিতাক্ষর দায়ভাগ থেকে মুসলিম পর্সোনাল - ল) আর নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য কোটা ব্যবস্থা কীভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় —তা বোঝা দুষ্কর।

সরকার মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন রকম সময় - বাঁধা পরিকল্পনা ঘোষণা করেন — যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ,বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে নানান উন্নতির লক্ষে পৌঁছানোর সরকারি সংকল্প থাকে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বর্তমান যা পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতে যা হতে চলেছে —তাতে উন্নয়নের কোনো মডেল, কোনো পরিকল্পনা কি প্রতিটি ভারতবাসীর জীবন -যাপনের মান উন্নত দুনিয়ার একজন ইউরোপীয়ান বা আমেরিকানের মতো করতে পারবে? উন্নয়নের কোনো মডেল অনুসরণ করে অলস-স্বপ্নবিলাসে মাতার আগে এই ব্যাপারটি খেয়াল রাখতে হবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ব্যাপকভাবে কমানোর কোনো মডেল ফলপ্রসূভাবে চালু না করতে পারলে কোনো উন্নয়নী মডেলই কার্যকর হবে না। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চিনও আমাদের মতো জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত একটি গরিব দেশ ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। এখন চিনের আর্থিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলিরও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিনের এক সন্তান নীতি এবং কঠোরভাবে সেই নীতি মেনে চলার মাধ্যমেই তার এতটা উন্নতি সম্ভব হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে এখনও উৎসাহ-শাস্তিদান প্রথাটুকু চালু করা গেল না—শুধু ভোট নির্ভর রাজনীতির বাধ্যবাধকতায়। কোনো দলই এই নীতি চালু করতে গিয়ে যে শ্রেণির মানুষের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (বাচ্চা জন্মানোর হার) সবচেয়ে বেশি — তাদের ভোট হারানোর ঝুঁকি নিতে চায় না। আমাদের লোকসভার নেতারা তো নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি বা বেতন-বৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলিতে সমস্ত দল-মত ভুলে গিয়ে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন — এই ব্যাপারটিতেও তাই নিন না — তাহলে তো কোনো দল আর 'সুযোগ' নিতে পারবে না — মাঝখান থেকে এ হতভাগা দেশের ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা অন্তত: তৈরি হত!

দুই : ভারতীয় গণতন্ত্র — প্রহরী, মেরুদণ্ড ও সেবকদের কথা

"আর কতদিন দু চক্ষু রগড়াবে?"

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ হল ভারতবর্ষ। কেমন গণতন্ত্র? প্রতিটি ছোটো-বড়ো নির্বাচন আসে আর বেশ কিছু মানুষ রাজনৈতিক হিংসার বলি হন। বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের 'নির্বাচিত প্রতিনিধিরা' কেমন চরিত্রের? আমাদের দেশে একটি ধারণা এখন স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে, যে গুন্ডা-মস্তান বাহিনী পুষতে না পারলে আর দুর্নীতিগ্রস্থ কালো টাকার মালিক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ম্যানেজ করতে না পারলে নির্বাচনে কোনো দল জিততে পারবে না। আমাদের সমাজও দেখে - শুনে এসব মেনে নিয়েছে। দেশের কয়েকটি রাজ্যের প্রধান শাসকদের বেশ কয়েকজনের 'রাজনৈতিক' জীবন শুরু হয়েছিল

গুন্ডামির মাধ্যমে। কারও কারও নামে একসময় ৩০-৪০ টি করে খুন -অপহরণ ও ধর্ষণের মামলাও ছিল। অর্থের আর পেশির জোরে এরা এখন সংবাদপত্র আর দূরদর্শন আলো করে রাখেন। সাধারণ মানুষ নাকি এদেরই ভোট দিয়ে জেতান! যদি ঘটনা তাই হয় — তাহলে সেরকম নির্বোধ মানুষের ভোটাধিকার থাকা উচিত কি? আসল ব্যাপার অন্যরকম — হয় মানুষজন এদের ভোট দিতে বাধ্য হন - নানা ধরনের চাপ সহ্য করতে না পেরে, আর না হলে তাদের ভোট এনারাই দিয়ে দেন, চালাদের মাধ্যমে।

আমাদের কী বিচিত্র ব্যবস্থা! একজন মানুষ অন্য একজনকে খুন করলে খুনি বলে তার পরিচয় প্রকাশিত হওয়া নির্ভর করে তার অর্থবল, লোকবল আর রাজনৈতিক যোগাযোগের উপর। খুনটি যদি সাধারণ গরিব মানুষ অবস্থাগতিকে করে ফেলেন, তখন তার 'ফাঁসী চাই, ফাঁসি চাই' বলে বুদ্ধিজীবীরা, মায় প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তির স্ত্রী ও মেয়েরাও মিছিল করতে বেরিয়ে আসেন —আর বিজন সেতু হত্যাকাণ্ড থেকে ছোটো আঙ্গারিয়া, নানুরের মতো গণ-হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলিতে, অথবা খেজুরির কলেজ ছাত্রী সুজাতার নৃশংশ ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ড থেকে শুধুমাত্র মুরশিদাবাদ জেলায় প্রতি বছর গড়ে ২৫-৩০ টি ধর্ষণ-হত্যার এরকম যে ঘটনাগুলি ঘটে, সে ব্যাপারে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের 'বিবেক' ঘুমিয়ে থাকতে পছন্দ করে — কারণ মন্তব্য করতে গেলে সুযোগ-সুবিধে হারানোর ভয় আছে যে! এদিকে আবার নিজের স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যটি লুকিয়ে রেখে বিচ্ছিন্নতাবাদী একটি দাবিকে সামনে এনে কয়েকশো মানুষকে খুন করে আমাদের জনৈক 'পাহাড়ি' এখন মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ 'নেতা' বনে গেছেন। উনি মাঝে-মধ্যে হুংকার ছাড়লেই মুখ্যমন্ত্রী- প্রধানমন্ত্রী সবাই ছোটেন ওনাকে কথায় (?) তুষ্ঠ করতে।

আমাদের দেশের বিহার রাজ্যটি একটি 'মিথে'পরিণত হয়ে গেছে, দুভাবে ভাগ হওয়ার পরও এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এত গুণের গুণী কেরালার কথা কেউ বলে না — সব রাজ্যই নিজেদের সঙ্গে বিহারের তুলনা করে। বক্তব্য একটাই —বিহারের থেকে আমরা ভালো রেখেছি মানুষকে। সেইজন্যই বোধহয় অবচেতন মনে রাজনীতি সম্পর্কিত লোকেরা 'বিহারি' হতে চান, আর তাই বেশ কিছু রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা —সবই বিহারকে অনুসরণ করে চলেছে। এছাড়া রাজনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বিহারকে অনুসরণ করে না এমন রাজ্য খুব কমই আছে। Beharisation of Indian Politics যেন সবারই অঘোষিত উদ্দেশ্য হয়ে গেছে।

আমাদের আইন ব্যবস্থা মাঝে মধ্যে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের প্রতি হুংকার ছাড়েন — নির্বাচনে বেশি টাকা খরচ করা চলবে না ... ইত্যাদি। রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে যেসব হিসেব পেশ করা হয়, আর যা টাকা খরচ করা হয় — দুটো অঙ্কের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না— আর তা জানেন না এমন শিক্ষিত ভারতবাসী বোধহয় একজনও নাই। অবশ্য এজন্য রাজনীতির লোকজনকে কোনো আইনগত সমস্যার পড়তে হবে না — এসব তো কথার কথা। ব্যবসায়ীরা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে

টাকা দেন কার স্বার্থে? রাজনীতির লোকজন বলবেন তাদের দলের আদর্শকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা করে — কিন্তু তবু কেন যে প্রতিটি বড়ো নির্বাচন শেষ হওয়ার পরপরই চুপিচুপি কোনো প্রচার ছাড়াই হঠাৎ করে সমস্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম একলাফে অনেকটা বেড়ে যায় — আর সে ব্যাপারে রাজনীতির আগুন-খেকো ছোটো-বড়ো-মাঝারি নেতারা কেন চুপচাপ থাকেন — তা কেউই বুঝতে পারে না। ব্যবসায়ীরা কেবলমাত্র লাভ করার জন্যই 'পুজি' বিনিয়োগ করে - এ তো অনেক পুরানো কথা। আমাদের জনৈক প্রধানমন্ত্রী বহুদিন আগে বলেছিলেন যে কালোবাজারি, মজুতদার আর ভেজালদার ব্যবসায়ীদের প্রকাশ্য রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন — পঞ্চাশ বছরেও সেরকম শক্ত ল্যাম্পপোস্ট বোধ হয় তৈরি হয়নি।

আমাদের দেশের রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন — তাদের মাঝে মধ্যেই দেখা যায় জেনিভা সফর করতে। নিন্দুকেরা বলে সুইস ব্যাংকে জমানো টাকার ব্যাপারেই নাকি ওনাদের এই সফর। একদিকে বিদেশ থেকে বেপরোয়া ঋণ নিয়ে দেশের মানুষের মাথার চুল অবধি বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে সেই ঋণের টাকার একটা বড়ো অংশ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত লোকজন ও তাদের প্রসাদ প্রার্থীরা নামে-বেনামে নানা ব্যবসায় খাটাচ্ছে৪৯

বা দেশি-বিদেশি ব্যাংকে জমা করছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের এক বড়ো শক্তি হল তার বিচার ব্যবস্থা, সংবিধানে তেমনই বলা আছে। একে তো বিচার ব্যবস্থার অনেক আইন আজ অবধি আইন বইয়ের বাইরে বেরোয়নি, তবু যেটুকু নিরপেক্ষতা মানুষ এখনও আশা করে, তা বিচার ব্যবস্থার উপরেই। বিচারব্যবস্থাও কি খুব স্বচ্ছ? কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ধরা পড়ার পর জনৈক দক্ষিণভারতীয় নেত্রী বা জনৈক উত্তর ভারতীয় নেতা এবং এরকম ছোটো-বড়ো অনেক রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা যেভাবে উচ্চতর আদালত থেকে ছাড়া পেয়েছেন—তা কিন্তু খুব পরিষ্কার নয়। বিচারকদের যা বেতন, তা কি সব ক্ষেত্রেই তাদের জীবনযাত্রা আর আর্থিক সঞ্চয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? কে আর খোঁজ নিচ্ছে! তা ছাড়া অপরাধী শনাক্তকরণে বা সত্যি-মিথ্যা নির্ণয় করার জন্য 'টুথ ইঞ্জেকশন' ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুরু করলে তো এত আইন -আদালতের ঘুর পথের প্রয়োজন পড়ে না। ব্যাপারটিকে কেন যে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তা বোঝা দুষ্কর।

সরকার বাহাদুর একশ্রেণির উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবীর বেতন অত্যধিক বাড়িয়ে রেখেছেন রাজনৈতিক নেতাদের নানান দুষ্কর্ম চাপা রাখতে আর আর্থিক দুর্নীতির পথ নিষ্কণ্টক রাখতে, অথচ মিলিটারি-বি.এস.এফ সৈনিকদের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন সবচেয়ে কম বেতন—চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের মতোই প্রায় একই হারের। অথচ এদের যখন লাদাখ, শিয়াচিন বা কাশ্মীরের অন্যান্য অনেক জায়গার ডিউটি করতে হয় — সেখানকার তাপমাত্রা থাকে জল জমে বরফ হওয়ার তাপমাত্রার অনেক নীচে। রাজস্থানের মরুভূমির মধ্যে মাঝেমধ্যে ভাজাও হতে হয় এদের,অথচ বেতন এত কম। পুলিশের বেতনও প্রায় একই রকম। একজন সাধারণ ইস্কুলমাস্টারও সমবয়সি থানার বড়োবাবুর চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশি বেতন পান।

মেজোবাবু ছোটোবাবুদের বেতন এর অনেক নীচে — সভ্য সমাজে যা কহতব্য নয়। অথচ এদের সবাইকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। বেকারভরা এই দেশে যে-কোনো মূল্যে বোধ হয় জীবনকে কিনে নেওয়া যায়।

সর্ব-ভারতীয় বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে বসে পুলিশের বড়ো অফিসারের চাকুরি নিতে ভালো ছাত্ররা এখন আর আদৌ উৎসাহী নয়। মধ্যম-মেধার যেসব ছাত্ররা এই চাকুরিগুলির সঙ্গে যুক্ত হন—চাকুরিতে প্রবেশ করার দিন থেকে ক্ষমতার ঝাণ্ডাধারী রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দের সেবাদাস বা দাসানুদাস হয়ে নিজের বিবেককে খুন করে প্রশাসনের চেয়ারগুলিতে বসে মাসিক বেতন ও অন্যান্য সুবিধাগুলি নিয়ে প্রতিদিন হাজারও অন্যায় কাজ করা এদের কর্তব্য কর্ম হয়ে দাড়ায়। দিনের পর দিন এভাবে নোংরা ঘেঁটে বেঁচে থাকা হয়ে যায় এদের নিয়তি। একবার জনৈক বিধানসভা সদস্যের কথামতো চলতে নারাজ এক পুলিশ অফিসার সম্পর্কে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে থাকা একজন যথেষ্ট পরিণত বয়সের রাজনৈতিক নেতা মন্তব্য করেছিলেন — উনি যদি আদর্শবাদী, তাহলে পুলিশে এসেছিলেন কেন?

পুলিশ হল হুকুমের চাকর, এমন বাধ্য চাকর ভূভারতে পাওয়া দুষ্কর। বাধ্যতার নজির দেখলে চমকে উঠতে হয়। নিম্ন আদালতের ছোটোখাটো কেসের কথা বাদই থাক—খোদ সি.বি.আইয়ের ফাইল করা এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত গণহত্যা, ষড়যন্ত্র, মৃতদেহ লোপাটের মারাত্মক অভিযোগের মূল আসামি—যিনি আবার প্রতিদিন স্কুলে শিক্ষকতা করতে যান—তাকে সাত বছর ধরে পুলিশ 'খুঁজে পায় না'। অতি সম্প্রতি মালদহ জেলার খুন আর বোমা তৈরি করার অভিযোগে 'ফেরার' এক স্কুল শিক্ষককে পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল স্কুলে ঢুকিয়ে হাজিরা খাতায় বেশ কিছু দিনের ফাঁকা ঘরে টানা সই লাগানোর জন্য। অন্যদিকে কয়েকবছর আগে জনৈক আদর্শবাদী (পড়ুন মূর্খ) পুলিশ অফিসার দিনের বেলা খুন হয়ে যান — আর তার সম্ভাব্য হত্যাকারীও পুলিশ হেফাজতে খুন হয়ে যান — যাতে খুনের পেছনের আসল নায়ককে কেউ চিনতে না পারে — আর তারপর যথারীতি সব ধামাচাপা পড়ে যায়। খোদ রাজধানী কলিকাতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিভাগের জনৈকা উচ্চ-পদাধিকারী হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেলেন — অথচ তা নিয়ে সত্যিকারের খোঁজখবর করার গরজটুকুও প্রশাসনের তরফে দেখা গেল না। কী ভাবেই বা ন্যূনতম যোগ্যতা ছাড়াই উনি ওই চাকুরি পেয়েছিলেন, কেনই বা উনি স্বামীর সঙ্গে না থেকে একা ফ্লাটে থাকতেন, আর কেনই বা ওনাকে হারিয়ে যেতে হল — তা কোনোদিন প্রকাশ পাবে বলে মনে হয় না। শোনা যায় ওনার ঘরে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের অনেক ফাঁকা মার্কশিট সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছিল — তার পেছনেই বা কী রহস্য ছিল তা সম্ভবত চিরকালই অজানা থেকে যাবে।

পুলিশ নিরপেক্ষ নয়, পুলিশ ঘুষ খায়, পুলিশ দুর্নীতিগ্রস্থ — এসব কথা কয়েক শতাব্দীর পুরানো এবং সত্য। পুলিশ তো সরকারের হাতিয়ার — তাই 'তুমি যেমন চালাও, আমি তেমন চলি' ধরনের ব্যাপারটি চলে এক্ষেত্রে। শাসকের কাছে পুলিশ 'আমাদের পুলিশ', অত্যাচারিতদের কাছে পুলিশ 'তোমাদের পুলিশ'। জনৈক বিচারকের দৃষ্টিতে পুলিশ হল

দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী ও সংগঠিত আইনসম্মত গুন্ডাবাহিনী। কিন্তু সত্যি সত্যি কি কেউ চায় যে পুলিশ নিরপেক্ষ হোক? তাহলে কিছু করতে হবে না— শুধু পুলিশ দপ্তরটিকে স্বশাসিত করে দিলেই অনেকটা কাজ হয়ে যাবে। এরপর যেটুকু বাকি থাকবে - তা কিছু দিনের মধ্যেই জনমতের চাপে তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু এই স্বপ্নবিলাস কোনোদিনই পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নিজেদের অন্যায় অপকর্মগুলিকে চাপা দেওয়া বা নিজেদের প্রয়োজনে আইনসম্মত ভাবে অন্যায় কাজগুলি করিয়ে নেওয়ার এত ক্ষমতাশালী আর উপযুক্ত হাতিয়ার কোনো ক্ষমতাসীন দলই ছাড়তে চাইবে না, আর অন্যদিকে এরকম এক হাতিয়ার হাতে থাকলে সব ক্ষমতাশালী দলই তা ব্যবহার করার জন্য উশখুশ করবে।

শিশুরা ছেলেবেলা থেকে যা দেখে দেখে বড়ো হয় — তাই শেখে। আমাদের দেশের একটি শিশু দুর্নীতির এই পরিমণ্ডলে বড়ো হতে গিয়ে এগুলিকেই স্বাভাবিক অবস্থা বলে মনে করবে, এটাই স্বাভাবিক। কলকাতায় 'মাছভাত' নিয়ে মিটিং শুনতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়া বিনা-টিকিটের যাত্রী এক গ্রাম্য কিশোরের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে সে টিকিট কাটেনি কেন, তার উত্তরে ছেলেটি বলল যে মিটিং যেতে গেলে বাসে-ট্রেনে কোথাও টিকিট কাটার দরকার হয় না। কোনো রাজনৈতিক দলের মিটিং থাকলেই বাস দখল করে নেওয়া (কখনও বা দয়া করে তেলের খরচটুকু দিয়ে অথবা না দিয়েই) বা ট্রেন দখল করে হাজার হাজার মানুষকে বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জার করে কলকাতা বা অন্য কোনো বড়ো শহরে নিয়ে যাওয়ার যে প্রথা চালু হয়ে গেছে— সাধারণ মানুষের কাছে সেটাই হয়ে গেছে নিয়ম। নানা 'ইজমের' আদর্শের কথা বলে মিটিং গরম করেন যেসব নেতা-নেত্রী, তাদের কাছে বিনীত প্রশ্ন — সাধারণ মানুষকে টিকিট না কেটে বাসে-ট্রেনে চড়ানোর অভ্যাস করিয়ে কোনো নীতিশিক্ষা দেন আপনারা?

জানি — বোবার শত্রুতা করা অসম্ভব।

তিন: অত: কিম?

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের দুরবস্থা নিয়ে চিন্তা করে করে রাজনীতিবিদ নেত্রীবৃন্দ, উচ্চশিক্ষিত অর্থনীতিবিদ এবং আমলাদের সম্ভবত: রাত্রে ঘুম হয় না। সাধারণ মানুষের কল্যাণ নিয়ে এনারা এতটাই ভাবিত যে, কয়েকবছর অন্তর অন্তরই শুনতে পাই সরকারি পরিকল্পনার বদল হচ্ছে—আরও আধুনিক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার পর পর জানা গেল সরকারি উদ্যোগে বড়ো বড়ো শিল্প কারখানা গড়লেই মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। এরপর জানলাম, না-শিল্প নয়, কৃষির উন্নতিতেই তা হবে। সেজন্য রাসায়নিক সার ও পোকামারা বিষের ব্যাপক ব্যবহার এবং ভূগর্ভস্থ জল তুলে সারাবছর চাষাবাদ করার পথেই মুক্তি। এর ফলস্বরূপ নতুন নতুন জায়গায় আর্সেনিক দূষণের ফলে মানুষ মারা যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে, আর উপকারী কীট-পতঙ্গ-পাখি-জীবজন্তু সব মরে -যাওয়ায় আর মাটির অম্লতা বেড়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদন আবার কমতে শুরু করেছে। মাঝখান থেকে বনজঙ্গল সব সাফ হয়ে গিয়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে, আর জল-স্থল-অন্তরিক্ষে এবং আমাদের শরীরে

দুনিয়ার বিষ জমে থাকছে। এখন আবার বলা হচ্ছে - না এসব কিছুতে নয় —বিদেশি ব্যবসাদারদের আমাদের দেশে ডেকে নিয়ে আসা ছাড়া গতি নাই। এতেই আমাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি মিলবে। (হায় স্বাধীনতা আন্দোলন, হায় মোহনদাস গান্ধি!)

একটা কথা আমাদের মতো অকিঞ্চন মানুষের মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না --- যে আমাদের জনাকীর্ণ এই দেশের সমস্যার ধরন একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব, সমাধানের রাস্তাটিওতো তাই নিজস্ব ধরনেরই হবে। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ধারণা , ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা, প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের ধারণা এবং অবশ্যই মানুষের আর্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি সরাসরি এদেশে চালাতে গেলে শুধু নতুন কিছু বিকৃতির পথ উন্মুক্ত হবে — হচ্ছেও। প্রথম বিশ্বের উন্নত দুনিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, কৃষিবিজ্ঞান আর শিল্পস্থাপন সংক্রান্ত ধারণাকে এই জনাকীর্ণ দেশে চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে স্বাধীনোত্তর পর্বে বারবার। যখনই এক সিস্টেম ব্যর্থ হয়েছে — তখনই বিদেশি কোনো দ্বিতীয় সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের সম্পদ সারা পৃথিবীর কাছে ছিল লোভনীয় — তাই নানা যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লুঠেরারা এদেশে লুঠপাঠ করতে এসেছে। সেই সম্পদশালী দেশ এরপর পরিণত হয়েছিল এক ভিখারি দেশে। এখনও সেভাবেই আমরা পরিচিত। এক সুদীর্ঘকাল আমরা ঘুমিয়েছিলাম। আমরা চোখ খুলেছিলাম ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, তাই আমাদের অবচেতনে ইউরোপ (এবং তস্য মানসকন্যা আমেরিকা) যা করে, তার বাইরে অন্য কিছু ভাবা বা করা সম্ভব বলে বিশ্বাসই জন্মায় না। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর এই ধারণা আরও ব্যাপ্তিলাভ করেছে। তা ছাড়া আমাদের দেশে যারা পরিকল্পনা তৈরি করেন — তারা প্রায় সবাই বিদেশে পড়াশোনা করা লোক, দেশের চেয়ে বিদেশকেই তারা বেশি চেনেন। নিজেদের ভিড়-ভাট্টাময় ভিখারিভরা দেশ আর উলটোদিকে ঝাঁ চকচকে পাশ্চাত্য — এই দুইয়ের তুলনা সবসময় এদের অবচেতন মনের মধ্যে চলে। সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করতে গেলেই তাই এনারা ইউরোপীয় শিক্ষার চশমার মধ্যে দিয়েই সব কিছু বোঝার চেষ্টা করেন, সমাধান খোঁজারও চেষ্টা করেন এভাবেই। এর ফলে আসল সমস্যাগুলির সঠিক সমাধানের রাস্তা না খুঁজে সবসময় আমাদের দেশের পক্ষে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কিছু করা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

যে কোনো সমস্যার মধ্যেই তা থেকে বেরোনোর রাস্তার ব্যাপারে একটি ইঙ্গিত থাকে — সমস্যার স্বরূপটি ঠিকমতো বুঝে নিতে পারলে সেই রাস্তার খোঁজ পাওয়া খুব কঠিন বিষয় নয়। সমস্যা সমাধানের জন্য একরোখা হতে হয়; সেজন্য যেখানে সমস্যা যত জটিল, সেখানে তার সমাধানের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একরোখা মানসিকতার প্রয়োজন হয় তত বেশি। পিঠ বাঁচিয়ে, সবদিক সামলে, সমস্ত ব্যাপারে আপস করে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কোনো পরিবর্তনই আনা যায় না —সমস্যার সমাধান করা তো অনেক পরের ব্যাপার। কোনো বড়ো-সড়ো পরিবর্তন আনতে গেলে কিছু মানুষের বিশ্বাসের উপর এবং কিছু চালু পদ্ধতির উপর হাতুড়ির আঘাত হানতেই হবে, এবং সেজন্য কিছু মানুষের বিরোধিতার মুখোমুখি হতেই হবে। এটাই নিয়ম।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির অতি উচ্চ হারই হল আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যের সবচেয়ে বড়ো কারণ।

এর থেকেই উদ্ভব হয় চিরস্থায়ী চরম দারিদ্র্য আর অশিক্ষা। এই অবস্থার মধ্যে বসবাস করা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-চেতনা খুব উচুঁস্তরের হওয়া সম্ভব নয়— তাই এরকম মানুষকে নিয়ে যা খুশি তাই করা বেশ সহজ। কাজেই আসল কারণকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে প্রথমেই। অশিক্ষিত মানুষ নিজে থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল বুঝে নেবে শিক্ষিত মানুষদের মতো, আর সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে নেবে — এ মডেল এতদিন চালানো হল — নিট ফল কি ফলেছে তা সবাই জানেন। সেজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির অতি উচ্চ হার কমাতে চিনের মডেল অনুসরণ করা ছাড়া কোনো রাস্তা খোলা নেই। এদিকে বুদ্ধিতে নাবালক আমাদের দেশের এক বড়ো অংশের ভোটারের ভোট হারানোর ভয়ে রাজনৈতিক দলগুলি ভিমরুলের চাকে ঢিল মারতে চাইবে না কেউই। কোথায় কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগবে, কোথায় কোনো ব্যক্তির একমাত্র সন্তান দৈবাৎ মারা গেলে ব্যক্তিটির 'বংশ'রক্ষা হবে না (মহাপুরুষের জীন লুপ্ত হয়ে যাবে!) — এসব ছোটোখাটো অনুভূতিগুলিকে গুরুত্ব দিলে কোনোদিনই কিছু করা যাবে না, আমাদের দেশটিকেও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। এ নিয়ে জনমতের চাপ তৈরি হওয়া দূরে থাক, জনমত তৈরি করার উদ্যোগও কোথাও চোখে পড়ছে না। সুতরাং শেষ প্রশ্নটি খুবই পুরানো — বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

—

লিবিডো বনাম একনিষ্ঠতা

... নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভালো জিনিস, সংসারে তার তুলনা নেই। ... কিন্তু আমি জানি ব্রজনাথ কীসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশো' বছরের মধ্যে আর ও মুখো হননি। কংস-টংস সব মিছে কথা । আসল কথা শ্রীরাধিকার ওই একনিষ্ঠ প্রেম। তবু তখনকার কালে ঢের সুবিধে ছিল, মথুরায় লুকিয়ে থাকা চলত। কিন্তু একাল ঢের কঠিন। না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। ...

সতী — **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার পুরাণ-রূপকথা- উপকথা থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের গল্প উপন্যাসেও একটি বিষয় নিয়ে গল্প প্রায়ই দেখা যায়, তা হল সম্রাট- রাজা-জমিদার থেকে ধনী ব্যক্তি — এদের বাড়িতে একনিষ্ঠ সুন্দরী বউ থাকা সত্ত্বেও থাকে অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ। এই 'অন্য নারীটি' হন সাধারণতঃ অসুন্দরী এবং অপেক্ষাকৃত ছোটো বংশ-মর্যাদার, বাল-বিধবা থেকে বাইজি বা দেহ-পসারিণী — বিভিন্ন গোত্রের। এই সব কাহিনিগুলিতে সবক্ষেত্রেই পুরুষটির দুশ্চরিত্র স্বভাব, ভ্রমরবৃত্তি, নীচতা আর কাণ্ডজ্ঞান-হীনতাকেই এই ধরনের ঘটনাগুলির জন্য দায়ী করা হয় এবং যথারীতি 'শিষ্ঠের পালন, দুষ্টের দমন' নীতিকথা মেনে গল্পগুলির শেষভাগে এইসব পুরুষদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তারা অনুশোচনার মধ্যে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাতে বাধ্য হয়। আজকের মধ্যবিত্ত বঙ্গ-সমাজেও এই নীতিবোধ সমানে সক্রিয়, সবাই একই কথা বলবেন। তবে এই সহজ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি বড়ো ফাঁক থেকে যায়—যা সহজে নজরে পড়ে না। একনিষ্ঠ গৃহবধূটিরও কিছু ভুল থাকা সম্ভব — এটাই আমরা ভাবতে অভ্যস্ত নই। পুরো ব্যাপারটি খোলাচোখে একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি জীবই (মানুষ-সহ) বহুগামী চরিত্রের। সভ্যতার পথে চলতে গিয়ে মানুষ সমাজ, সংসার গঠন করতে গিয়ে সামাজিক প্রয়োজনেই একনিষ্ঠতাকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছে — আর সমাজ-সংসার-নীতিবোধের চাপে সামাজিক মানুষ একনিষ্ঠতাকেই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে। তবে প্রতিটি পুরুষই Polygamic আর প্রতিটি নারীই Polyandric —অন্তত মানসিকভাবে—এ কথা ফ্রয়েড সাহেবের কল্যাণে অন্তত শিক্ষিত মানুষদের একাংশ মেনে নিয়েছেন। মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনাকে সংযত করার জন্য শুধু নীতিবোধের বাঁধ নয়, আরও নানা সংস্কারের পাঁচিলও তোলা হয়েছে। তবে জান্তব প্রবৃত্তিগুলি হয় অনেক তীব্র, তাই পুরো ব্যাপারটি শেষমেষ হয়ে দাঁড়ায় একটি স্বাভাবিক আবেগের নদীকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখার

মতো ব্যাপার। অবশ্য এক শ্রেণির মানুষ থাকেন, যারা শরীরে হরমোনের গোলযোগ ঘটিত কারণে বা জন্মগত কিছু শারীরিক গঠনগত গণ্ডগোলের কারণে অথবা রক্তাল্পতা, মেদবৃদ্ধি বা ব্লাড-সুগারের মতো কিছু রোগের কারণে অস্বাভাবিক রকমের কম যৌন আবেগ অনুভব করেন। এছাড়া আরেক শ্রেণির মানুষ আছেন, যাদের মধ্যে সবাই প্রায় মহিলা—তারা কোনো শারীরিক কারণ ছাড়াও গভীর কোনো যৌন আবেগ অনুভব করতে পারেন না। এদের ক্ষেত্রে কারণটা হল মানসিক। ধর্মভীরু মানুষ, বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ধর্ম আর সংস্কার আলাদা কোনো ব্যাপার হয়ে থাকে না — নানা সংস্কার পালনকেই তাই অনেকে ধর্মীয় আচার পালন বলে মনে করেন। সেজন্য ধর্মের মোড়কে মোড়া সংস্কারের চাপ যখন হয়ে যায় অত্যধিক, তখন যৌন জীবনযাপন করা একটি পাপকাজ — অবচেতন মনে এই ভাবনা কাজ করে যাওয়ার কারণে এই সব মানুষ ধীরে ধীরে কামশীতল হয়ে যান। এছাড়া রাজা-জমিদারদের 'পর্দানসিন' বউরা মেয়েদের মধ্যেই চব্বিশঘণ্টা থাকতেন, সেজন্য (পর) পুরুষমুখ না দেখতে পাওয়াটাও এদের যৌনশীতল হওয়ার আর একটি কারণ হতে পারে। ধর্মীয় অনুভূতিবোধ, পাপবোধ আর ধর্মীয় সংস্কারের নামে যৌনতা ব্যাপারটিকে ঘৃণা করতে করতে যেমন কাম শীতলতা আসতে পারে, তেমনি আক্ষরিক অর্থে 'একনিষ্ঠ' হলেও নারীদের মধ্যে কামশীতলতা আসতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়গুলি একসঙ্গে কাজ করে।

কামশীতল নারীর স্বামীরা আবার প্রায়শই দিনরাত কামবৃদ্ধির নানান বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। রাজা-জমিদারদের বাইজি নাচ দেখা ও মদ্যপানসহ নানান আমোদ-প্রমোদের মধ্যে এই ব্যাপারটিও ছিল। এছাড়া ধর্মীয় ও অন্যান্য সংস্কারগুলি, এমনকি একনিষ্ঠতাকেও মেনে নেওয়ার কোনো দায় বা চাপও এনাদের নিতে হত না। সুতরাং এই রকম মানুষ যে কামুক, বা নিদেনপক্ষে স্বাভাবিক কাম-অনুভূতি সম্পন্ন হবেন, এটাই স্বাভাবিক। সেজন্য এইরকম পুরুষের 'ধার্মিক' 'একনিষ্ঠ' পত্নীতে বেশিদিন যে আসক্তি থাকবে না, তারা বাইরের নানা কাম-উত্তেজক ছলাকলা জানা মেয়েদের কাছে অথবা বাল-বিধবাদের মতো যৌন-ক্ষুধায় পাগল মেয়েদের কাছে যাবেন — এটা কিন্তু খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

আমাদের বঙ্গ-সমাজের উচ্চবিত্ত অংশ বাদে অন্য অংশে আজও যৌনতা নিয়ে যে-কোনো আলোচনাই অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে, অথচ এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের অধিকাংশেরই যা জ্ঞান বা ধারণা তার প্রায় সবই ভুল। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহবধূরা সাংসারিক কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, আর রাত্রে সবাইয়ের খাওয়া-দাওয়া মিটে যাওয়ার পর বাসনকোসন ধুয়ে শ্রান্ত শরীরে বিছানায় শোয়ার পর এনাদের যৌন জীবনযাপন হয়ে যায় শুধুমাত্র এক দায়িত্বপালন; অন্যদিকে সারাদিনের নানা কাজে পরিশ্রান্ত পুরুষটির ভরপেট খাওয়ারপর বিছানায় গিয়ে যৌনতা হয়ে উঠে ঘুমের ট্যাবলেট।

যৌনতা ব্যাপারটি লজ্জার নয়, পাপেরও নয়, ভয়ের তো নয়ই — একথাটি সঠিকভাবে অনেকে উপলব্ধি করতে পারেন না। বিগতযৌবনা মানুষজন; বিকৃত, কদাচারী ধর্মব্যবসায়ী; নিজে চরম ভোগীর জীবন-যাপন করে চলা অথচ 'ত্যাগের' উপদেশ-দানকারী কিছু গুরু ঠাকুর এবং নানান শারীরিক-মানসিক অসুস্থতার কারণে স্বাভাবিক যৌন অনুভূতি লাভে অক্ষম কিছু মানুষ অনেক সময় নানা 'জ্ঞানের কথা' বলে মানুষকে ভুল রাস্তা দেখান। সুস্থ-স্বাভাবিক সম্পর্ক রক্ষা করার স্বার্থেই আমাদের বিবাহিত দম্পতিদের Joy from sex ব্যাপারটি ইউরোপ বা আমেরিকা থেকে শেখার দরকার আছে। ব্লু-ফ্লিম, ক্যাবারে ড্যান্স - এসব বিকৃতিগুলি আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি — অথচ Joy from sex-এর idea টি আমরা অশ্লীলতার মোড়কে পুরে সরিয়ে রেখেছি। প্রতিটি বিবাহিত দম্পতিরই প্রয়োজনে এই ব্যাপারে Councelling করা দরকার, তাতে সমাজ অনেক বিকৃতির হাত থেকে রেহাই পাবে।

—

প্রসঙ্গ : ধর্ষণ ও সমকাম

জীবের বংশগতি ধরে রাখার প্রয়োজনে বিবর্তনের ধারায় সৃষ্টি হয়েছিল যৌনতার। আদিম পৃথিবীতে জোঁকের মতো একই জীবের কয়েক টুকরো হয়ে গিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কতকগুলি জীবের জন্ম দেওয়া থেকে শুরু হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে যৌন বোধের সৃষ্টি- এটি বিবর্তনের এক ফসলমাত্র। জীব-সৃষ্টির এই দিকটি ভাবতে গেলে আমাদের জীব-জগতের সমস্ত পশু-পাখির মধ্যে (উদ্ভিদের মধ্যেও!) যৌন-অনুভূতি এক 'জান্তব' অনুভূতি হিসাবে কাজ করে চলে — একথা বোঝা যায়। যৌনতার সাহায্যেই এসব জীবের জীবনের ধারা বংশ- পরম্পরায় বয়ে চলে — তাই প্রতিটি জীবের মতো মানুষের জীবনেও যৌনতা এক স্বাভাবিক ব্যাপার। আবার মানুষই এই গ্রহের একমাত্র জীব, যারা জীবসৃষ্টির প্রয়োজন ছাড়াও যৌনতাকে উপভোগ করতে পারে — উন্নত মগজের সহায়তায়। এই 'উন্নত মগজ' থাকার কারণেই আবার মানুষের মধ্যেই কেবল নানারকম অস্বাভাবিক যৌনতার ব্যাপারটি এসেছে। এই রকম এক অস্বাভাবিক যৌনতা হল জোর করে যৌন-মিলন করা — ধর্ষণ। সাধারণত ধর্ষণকে এক 'পাশবিক' ব্যাপার বলে বর্ণনা করা হয় — অথচ কোনো প্রজাতির পশু-পাখির মধ্যেই ধর্ষণ প্রবৃত্তি নেই। এক মাদি হাতির জন্য একাধিক মদ্দা হাতির নিজেদের মরণপণ লড়াই আছে, যৌন-মিলনের পরবর্তী পর্যায় ডিমের পুষ্টির প্রয়োজনে প্রাকৃতিক নির্দেশে কয়েক জাতের মহিলা মাকড়সা বা ফড়িং- এর মিলনের পর পরই পুরুষটিকে খেয়ে নেওয়ার রেওয়াজ আছে — কিন্তু ধর্ষণ নেই। কাজেই ধর্ষণকে কোনোভাবেই একটি স্বাভাবিক পাশব প্রবৃত্তি বলে মেনে নেওয়া যায় না। ঠিক তেমনই এক অস্বাভাবিক ব্যাপার হল সমকাম। পুরুষ-পুরুষ বা নারী-নারী সমকাম — দুইই অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক ব্যাপার। পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের মধ্যে এই ধরনের ব্যবহারের কোনো অস্তিত্ব নাই।

ধর্ষণ ও সমকাম — দুটিই অস্বাভাবিক আচরণের আওতায় পড়লেও একটির জন্য বিশ্বব্যাপী আইন-ব্যবস্থা ও মিডিয়া শাস্তিমূলক আর নিন্দাসূচক মনোভাব রাখে ও সেইভাবে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়, আর অন্যটির জন্য এখন চলছে প্রশ্রয়সূচক ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার পালা।

সমকামীদের কার্যকলাপের পক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হয়। বলা হয় - স্বাভাবিক যৌন জীবনে যারা আনন্দ না পেয়ে অন্যরকম যৌন জীবনযাপনে আনন্দ পায়, তাদের কাছে এই অস্বাভাবিকতাই স্বাভাবিকতা, তাই তাদের স্বাধীনতা আছে নিজের ইচ্ছে মতো যৌন-জীবনযাপন করার। তারা তাদের তীব্র যৌন আবেগ চেপে রেখে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাবা বা মা হয়ে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হবেন কেন? পুরুষ সমকামীদের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও নারী সমকামীদের ক্ষেত্রে স্বামীকে নিয়ে সংসার করতে বাধ্য করা এদের উপর এক চরম মানসিক অত্যাচার। কোনো কারণেই মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করে তার উপর এরকম মানসিক অত্যাচার চালানোর অধিকার সমাজ বা আইনের কখনোই থাকা উচিত নয়।

এখন প্রশ্ন হল—সমাজ বা আইনের এইভাবে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপকে অবাঞ্ছিত ব্যাপার বলে মনে করলে যে ব্যক্তি ঘরে কুরূপা , রোগগ্রস্থা এবং খিটখিটে মেজাজের স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণহীনতা বা বিতৃষ্ণার কারণে কোনো সচ্ছল সংসারের সুন্দর স্বাস্থ্যের ফরসা, সুন্দরী, কলেজে পাঠরতা, অষ্টাদশী নারীর প্রতি হওয়া যৌন আকর্ষণ প্রতিরোধ করতে না পারেন, অথবা কোনো নারী যখন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়সের যৌন ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম ব্লাড সুগারের রোগী স্বামীকে তরুণ, সুদর্শন, সক্ষম কোনো উপপতির সাহায্যে ঘুমন্ত অবস্থায় সায়ার দড়ির ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে তার হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পেতে চান — তখন তা অন্যায় বলে মনে করা হবে কেন?

আমরা, যারা সমকামীদের হয়ে লড়াই করে সেমিনারে হাততালি পাচ্ছি, তারা কিন্তু মানব সভ্যতার অন্যতম প্রধান নিয়মটির কথা মাথায় রাখছি না। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যে-কোনো অস্বাভাবিক ইচ্ছেগুলি সমাজকে মেনে নিতে হলে তো আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে থাকা প্রথাগুলি — যেমন একগোষ্ঠীর অন্য গোষ্ঠীর পুরুষদের হত্যা করে তাদের মেয়েদের লুঠ করে আনা বা সম্রাট ও বিত্তশালী পুরুষদের হারেম প্রথা ও খোঁজা রাখার ব্যবস্থা - এ সবকেও মানুষের সভ্য সমাজে মেনে নিতে হয়। বানর-হনুমানের স্তর থেকে বিবর্তনের পথ বেয়ে 'মানুষে' রূপান্তরিত হয়ে সমাজ গঠন করার প্রয়োজনে যেসব প্রথাগুলি গড়ে উঠেছিল, (একনারী ও এক পুরুষ ইত্যাদি) আজও সেগুলির প্রয়োজন আগের চেয়ে বেড়েছে বই কমেনি — সেই প্রথাগুলি মানতে না চাইলে মানবসমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলে বাস করাই ভালো।

—

ভণ্ডামি, সোডোমি ও এইড্‌স

বিবর্তনের ধারায় প্রতিটি উন্নত প্রজাতির জীবের মধ্যে পুরুষ ও নারী — এই দুই ধরনের জীবের সৃষ্টি হয়েছে পার্থিব প্রয়োজনেই। যৌনতার সৃষ্টিও হয়েছে একই প্রয়োজনে। মানুষ এই ব্যাপারে একটি উদাহরণ, ব্যতিক্রম নয়। সক্ষম নর - নারীর মধ্যে থাকা জৈব আকর্ষণ তাই এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাপার। কিন্তু যখন কোনো কারণে এই আকর্ষণকে জোর করে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়, জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে মানতে বাধ্য করা হয় — তখন তা শুধুমাত্র যৌন অবদমনকেই ডেকে আনে। নানা ভণ্ডামির লেবেল লাগিয়ে এই অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বলে চালাতে গেলে অবদমিত যৌনতা বিকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়ার রাস্তা খুঁজে নেয়। যুদ্ধ বা দেশরক্ষার প্রয়োজনে গড়া একলিঙ্গের দলবদ্ধ সেনাবাহিনী অথবা ধর্মীয় কারণে গড়া গুরু- সাধু - মহারাজদের একলিঙ্গ সমাজ— যেখানেই জোর করে সক্ষম জীবের এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে—সেখানেই আদিমতম রিপুটির বিকৃত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। সমকামী মানুষদের এক ব্যাপক অংশের সৃষ্টি হয়েছে এভাবেই।

বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সু-শৃঙ্খল ধর্মনির্ভর জীবনযাপনের মাধ্যমে সু-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিশুদের জন্য অনেক আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র খুলে রাখা হয়েছে। এসব কেন্দ্রগুলিতে শিশুশিক্ষা থেকে উচ্চ বা উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণত একসঙ্গে রাখা থাকে। ধর্ম-নির্ভর নিয়ম-শৃঙ্খলাও এখানে পালিত হয় কঠোরভাবে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সমস্ত বয়সের পড়ুয়া এবং তাদের শিক্ষকরা (যাদের অধিকাংশই হন ধর্মীয় পদাধিকারী মানুষ) এবং শিক্ষকদের সহায়করা — সবাই হন একই লিঙ্গের। এই রকম কঠোর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে শিশুবয়স থেকে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষালাভ করা অনেক শিশুর অভিজ্ঞতা কিন্তু হয় মারাত্মক। জোর করে যৌন অবদমন পালন করার চেষ্টা করতে গিয়ে বয়স্ক আবাসিকদের একাংশের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের সমকামী। তাদের হাতে অনেক শিশুকে অত্যাচারিত হতে হয়। এছাড়া যেসব জায়গায় কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কিছু 'গুরু' একসঙ্গে বাস করেন, সেখানে ভবিষ্যতের গুরু তৈরি করার জন্য কিছু কমবয়সি বালককেও নির্বাচন করে ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাখা হয়। সমস্যা হল এই সব 'গুরু'দের (সাধু, মহারাজ, ধর্মযাজক ইত্যাদি) সবাই যে আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন হবেন—তার কোনো মানে নেই। এদের একটি বড়ো অংশই সাধারণ মানুষের চোখে সম্মানীয় এক আরামদায়ক জীবিকা হিসাবে এই জীবনকে বেছে নিয়েছেন। তা ছাড়া 'উর্দ্ধরেতা' হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে সেই পথে জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা নেওয়া খুব কঠিন কোনো কাজ নয়; কিন্তু কোনো আদর্শ দিনরাত মনের মধ্যে জেগে থাকলে আলাদা কথা—না হলে সংযমের (আত্মনিগ্রহের?) লেভেল খুব উচ্চস্তরের না হলে সেই প্রতিজ্ঞা সারাজীবন মেনে চলা খুব কঠিন। তখন পুরো ব্যাপারটিই ভণ্ডামির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে

নানান সমস্যার সূত্রপাত করে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হল নানান কু-ইচ্ছাকে জোর করে অবদমন করে লোকের সামনে বা প্রতিষ্ঠানের সামনে 'সৎ' সেজে থাকার চেষ্টা করে চলা। ঠিক এই জায়গা থেকেই বিকৃতির জন্ম হয়। এরকম একদল বিকৃত মানুষের লালসার শিকার হয় যেসব শিশু - কিশোর — তারাও ভবিষ্যতে আর সুস্থ চিন্তা-ভাবনা করতে সক্ষম মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না—বিকৃত জীবনযাপন করা আর তা গোপন করে মুখে সৎ-পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের মুখোশ লাগিয়ে বাঁচতেই এরা অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আমাদের সাহিত্য বা ইতিহাসে এরকম অবদমন আর তার ফলাফল সংক্রান্ত অনেক কথা লেখা আছে। জোর করে কামের মতো এক মহাশক্তিধর আবেগকে ধর্মের মোড়কে ও সংস্কারের নামে চেপে রাখতে বাধ্য করা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক অবধি চলা বাল্যবিবাহ (বাল্যবিধবা) প্রথাকে যতই মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা হোক একসময় — বামুনের মেয়ে উপন্যাসে তার আসল অবস্থার একটি চিত্র এঁকে দিয়ে গেছেন শরৎচন্দ্র। কৌলিন্য প্রথা কীভাবে বর্ণসংকরের উৎপত্তি হওয়ার কারণ হয়ে উঠেছিল — তা লিখে গেছেন হুতোম। স্বাভাবিক আবেগকে চেপে রেখে অস্বাভাবিক জীবনযাপন করতে মানুষকে বাধ্য করা হলে এরকম ঘটনা ঘটবেই।

মদ্দা ঘোড়ার 'মস্তি' হওয়ার মতো যৌন অবদমনের মধ্য থেকে হঠাৎ যৌনতার বিস্ফোরণ অনেকসময় নানা মারাত্মক ধরনের অপরাধ -প্রবণতা জন্মানোর কারণ হয়ে উঠতে পারে। সেনাবাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত গণধর্ষণের অভিযোগ মিথ্যে বলে ধরে নিলে ভুল হবে। চোখ বন্ধ করে থাকলেই কোনো কিছুর অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যায় না — অবশ্য সেগুলি না দেখার ভান করা যায়। এই ধরনের সমস্ত বিকৃত জীবনযাপনের নৈতিক দিকটির কথা বাদ দিলেও (সমলিঙ্গ ধর্ষণ আমাদের দেশে কখনও 'খবর' হয় না, কিন্তু বাস্তবে অনেক ঘটে—নানান কারণে ধর্ষিতরা তা গোপন রাখতে বাধ্য হয়।) AIDS-এর মতো মারাত্মক রোগগুলির ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এর অবদান কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে কী? অতি সম্প্রতিক একটি সরকারি সমীক্ষার ফলাফল জানলে চমকে উঠতে হয়। দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত আমাদের জওয়ানদের শতকরা নয়জন এইড্‌স - এর জীবাণু শরীরে বহন করতে করতে 'দেশরক্ষার মহান ব্রতে' ব্যস্ত আছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে নিয়োজিত জাওয়ানদের মধ্যে এই হার শতকরা কুড়িভাগ। এখনও পুলিশ এবং ট্রাক-বাস-মিনিবাস ইত্যাদি পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত লোকজনের এবং তাদের স্ত্রী-প্রেমিকাদের উপর এরকম সমীক্ষা হয়নি, তাই রক্ষে! এসব সমীক্ষা হলে আর হাজারে আটজন নয় — এর অনেক বেশি এইড্‌স্ রোগীর সন্ধান পাওয়া যেত আমাদের এই পুণ্যভূমিতেই। আমাদের 'আধুনিক' সমাজ কবে এসব ব্যাপার নিয়ে খোলামেলা আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক পরিপক্কতা অর্জন করতে পারবে?

লেজ সোজা করার প্রতিযোগিতা

মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, ততই অসহিষ্ণু হয়ে যাচ্ছে। আজকাল প্রায়ই বাসে - ট্রেনে অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে যাত্রীদের সামান্য কারণে বা অম্পূর্ণ অকারণে ঝগড়া - চিৎকার করতে দেখা যায়। আমরা এসব দেখে কেউ বিরক্ত হই, কেউ বা ব্যাপারটি ঠান্ডা করতে গিয়ে নিজেরাই এর মধ্যে জড়িয়ে যাই — আবার কেউবা হয়তো এগুলিকে উপভোগও করি। আমাদের এইরকম সদা-সর্বদা Ready to fire মানসিক অবস্থায় থাকার পেছনে অনেক কারণ আছে, তবে প্রধান দুটি কারণের একটি হল insecurity — যার জন্য নিজের অজান্তেই সবসময় আমরা টেনশনে থাকি। আর্থিক-সামাজিক সমস্ত ব্যাপারে এই নিরাপত্তাহীনতার যে ভাব, তার প্রভাব বাদ দিলে বাকি যে বড়ো ব্যাপারটি এর পেছনে কাজ করে চলে, তার কারণ আজকের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মানুষের ভোগ বাসনাকে ক্রমাগত উশকে দেওয়ার কারণে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নানা অলীক স্বপ্ন, চাওয়া, পাওয়ার ইচ্ছে বেড়েই চলে, অথচ এই চাওয়াগুলিকে অর্জন করার কথা কেউ ভাবে না। সেজন্য আমরা নিজেদের যোগ্যতা, ক্ষমতা, সামর্থ্য বা এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে অনেক কিছু পেতে চাই।

সামাজিক Status রক্ষা করার সাংসারিক চাপ আমাদের অধিকাংশর মনের অস্থিরতাকে আর বাড়িয়ে দেয়। অথচ Status maintain করা ব্যাপারটি যতই মারাত্মক মানসিক অবস্থার জন্ম দিক না কেন — অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে এটি একটি হাস্যকর ব্যাপার বলে মনে হবে। নিজের স্তরের অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়া মনে হলে তখনই স্টেটাসের কথা মনে আসে। বৈভবের পারস্পরিক তুলনায় কারওরই কারওর থেকে পিছিয়ে থাকা চলে না — সেজন্য স্টেটাস সবসময় বাড়িয়ে যেতেই হয়, না হলে হীনম্মন্যতা অবধারিত। সেজন্য আমরা সবাই অন্যদের টপকে যাবার জন্য ছুটছি। বৈভব কেনার এই প্রতিযোগিতায় সবসময় প্রয়োজন হয় অর্থের—আরও বেশি অর্থের — তাই সোজা রাস্তার রোজগারে না কুলোলে বাঁকা রাস্তা ধরতে হয়। এরপর একদিন যদি বা মনে হল স্টেটাসটা মোটামুটি মেনটেন করা গেছে, অমনি কিছুদিনের মধ্যেই তুলনাটা আবার অগ্রবর্তীদের বা উচ্চতর স্তরের প্রতিযোগীদের সঙ্গে এসে যায়—তাই নিজেকে পিছিয়ে পড়া বলে মনে হয়। অন্যদিকে আবার রোজগার বা পদমর্যাদা বাড়ানোর তাগিদে বে-নিয়ম কিছু করলে মনের মধ্যে অবচেতনে সবসময় ধরা পড়ে যাওয়ার একটা টেনসান থাকেই, অথচ বে-নিয়ম করে বা বে-আইনি রাস্তায় হেঁটেও আমরা যা পাই, তারও সীমা আছে — আর প্রাপ্তির পরিমাণটি কখনই আমাদের ক্রম-বর্ধমান উচ্চাশা মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয় না, কারণ মানুষের চাওয়ার আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে বাতাস দিয়ে গেলে পাওয়ার আশা

কোনোদিনই কোনো সীমা মানে না — তাই ক্রমাগত হেরে যাওয়ার ক্ষোভ মনে জমতে থাকে। নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে যুক্ত হয় এই জমে থাকা ক্ষোভ, না পাওয়ার জ্বালা আর নদীর ওপারে থাকা মানুষজনের 'পাওয়া' দেখে মনে আসা ঈর্ষা— এসবগুলি একসঙ্গে বিস্ফোরকের স্তূপ হয়ে জমে থাকে মনের মধ্যে। সামান্য কারণে তাতে অগ্নিসংযোগ হয়ে গেলেই হয় বিস্ফোরণ। বাড়িতে স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে সামান্য কারণে তুমুল ঝগড়া-ঝাটি হওয়া থেকে শুরু করে সন্তানের পৃষ্ঠে অতি সামান্য কারণে কিলবৃষ্টি, সহকর্মীদের সঙ্গে খিটিমিটি, বাস-ট্রেনের সহযাত্রীদের সঙ্গে অতি সামান্য কারণে চেঁচামেচি-তর্কাতর্কি —সবগুলির সঙ্গে এর যোগ আছে। এইভাবে আমাদের অজান্তে আমরা সারাজীবন চেষ্টা করে যাইদেশি কুকুরের বাঁকা লেজটিকে টেনে সোজা করার। তবে হাত থেকে ছেড়ে গেলেই তাফের পূর্ববৎ বেঁকে যায়, এই যা!

"ণ জাতু কামঃ কামানুমুপভোগেন শম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবচভিবর্ধতে।।
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পাশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরির্তাজ্যেৎ।।"

"কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনা প্রশমিত হয় না। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লে যেভাবে জ্বলে ওঠে , কামনা ঠিক সেভাবেই বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যত শস্য; যব, ধান, স্বর্ণ, পশু এবং রমণীয়া স্ত্রীলোক আছেন, একজনের পক্ষেও তা পর্যাপ্ত নয়। এতএব ..."।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার — সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল রায়ের লেখা।)

পথ দুর্ঘটনা রোধ — একটি প্রস্তাব

আমাদের দেশে শহর বা মফস্‌সলে পথ দুর্ঘটনা তো রোজকার ব্যাপার, সেজন্য খবরগুলি যতদিন না আমাদের দোরগোড়ায় হাজির হয়, তত দিন আমাদের গা-সহা ভাব কাটে না। সরকারি তরফে 'পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের' মতো নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয় পথ দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য—তবে এসবে কাজ কতটা হয় তা সবাই জানেন। আমাদের দেশে পথ-দুর্ঘটনার একটি বড়ো কারণ হল অপরিসর রাস্তা, যা আবার প্রায় সারাবছরই থাকে খানা-খন্দে ভরা। বছরে একবার পেটোয়া কনট্রাক্টরদের মাধ্যমে রাস্তা সারানোর নামে কিছু টাকা খরচ করেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়—আর সারানো রাস্তা একদিন বৃষ্টি পাওয়ার পর আবার আগের রূপ ধারণ করে।

আমাদের রাজ্যে যারা সাইকেল রিকশা, ভ্যান রিকশা বা সাইকেল চালান তাদের কথা বাদই থাক — অধিকাংশ মোটর সাইকেল চালক ও ট্রেকার চালক এবং এক বিশাল সংখ্যার লরি-মিনিবাস ও বাসচালক রাস্তায় কেমন করে যানবাহন চালাতে হয়, সে সংক্রান্ত নিয়ম কানুনগুলি জানেনই না—মানা তো অনেক পরের ব্যাপার। মফস্‌সল শহরগুলিতে রিকশা চালানো একটি ব্যাবসা, ব্যবসায়ীরা এক একজন ২০০-৩০০ রিকশা তৈরি করে রাখেন — আর সেগুলি একবেলার বা সারা দিনের লিজে চালান গ্রাম থেকে আসা এবং শহরের বস্তিবাসী কিছু 'পেডলার'। এদের মধ্যে গ্রামে দিনমজুরি খাটার ফাঁকে রিকশা চালান— এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। এসব মানুষ কোথা থেকে জানবেন যান চলাচলের নিয়মকানুন? আবার মফস্‌সল শহরের ট্রেকার, টেম্পো ও ভাড়ার ট্যাক্সির চালকদের অধিকাংশের কোনো 'লাইসেন্স' ই নেই — পুলিশের জন্য মাসিক রেট ঠিক করা আছে। বাস-লরি-ট্যাক্সি চালকদের একাংশের এবং সমস্ত মোটর সাইকেল চালকদের কাছে 'লাইসেন্স' যা আছে, তা দালালদের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে পাওয়া—এজন্য কাউকে কোন 'টেষ্ট ড্রাইভ' টুকুও দিতে হয় না। এর সংশ্লিষ্ট দপ্তরটি কি মানদণ্ডের বিচার করে প্রতিবছর লোকাল বাসগুলিকে ' ফিট সার্টিফিকেট' দেন — তা ওনারাই বোধহয় কেবল জানেন। স্পঞ্জ উধাও হয়ে যাওয়া কাঠের 'সিট', লোহার পাত ফেটে অসংখ্য ব্লেড তৈরি হওয়া সিটের পেছনদিক আর দরজার পাল্লা, সামনে পেছনে লাগানো রি- রিসোল করা টায়ার, ধোঁয়ায় পথ অন্ধকার করে চলতে থাকা মান্ধাতা আমলের ইঞ্জিনের সব গাড়ি সারা রাজ্যে দাপিয়ে চলছে প্রতিদিন। গাড়ি পরীক্ষা করা দূরে থাক, গাড়িগুলিকে একবার চোখে না দেখেই প্রতিবছর বাস-লরির পারমিট বাড়িয়ে যাওয়া অথবা ইংরেজি অক্ষরটুকু চিনতে না পারা এবং খালাসি থেকে

দেখে দেখে শিখে 'ড্রাইভার' হওয়া মানুষজনকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া — এগুলি এখন 'নিয়ম' হয়ে গেছে।

বাস-লরির ড্রাইভারদের মাদকাসক্তি ও যৌনরোগ নিয়ে কোনো সমীক্ষার কথা জানা যায় না — যা নিয়মিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা একজন মানুষ সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিপুণভাবে গাড়ি চালাতে সক্ষম হবেন — এটা আশা করা মানে বিপদকে ডেকে আনা। এসব ড্রাইভারদের আবার অনেক সময় লাগাতার কয়েকদিন ধরে লরি-বাস চালাতে হয় — স্নান-ঘুম - বিশ্রামের বালাই না রেখেই। অন্ধকার রাত্রে একটা মাত্র হেডলাইট জ্বালিয়ে দুরন্ত বেগে রাস্তায় লরি চালাতে গিয়ে বিভ্রান্ত বাইক আরোহীকে হত্যা করার পরও তাই একজন ড্রাইভার অবিচলিত থাকতে পারেন। প্রথম যৌবনে কোনোভাবে একবার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে যাওয়ার পর আর কোনোদিনই এদের ড্রাইভিং করার উপযোগী দৃষ্টিশক্তি সহ শারিরীক ও মানসিক সক্ষমতা আছে কিনা তার সত্যিকারের পরীক্ষা নেওয়া হয় না।

একদিকে আমাদের রাজ্যের রাস্তাঘাটের হাল খুব খারাপ, তার উপর যারা এই রাস্তাগুলিতে নানা রকমারি যানবাহন চালান, তাদের অধিকাংশের এটুকু ধারণাও নেই যে রাস্তার বামদিক দিয়ে চলতে হয়। সামনের গাড়িগুলি কেন থেমেছে তা জেনে বা না জেনে ওভারটেক করে আগে যাওয়ার জন্য বড়ো- ছোটো যান চালকদের সবাই উদগ্রীব — ফলে যখন- তখন রাস্তার উপর তৈরি হয়ে যায় দু-দিকে তিন-চারটি করে সারি দেওয়া গাড়ির জ্যাম। পথচারীদেরও এ ব্যাপারে জ্ঞান প্রায় একইরকম। ফলে যা হওয়া সম্ভব, যা হওয়া উচিত, তাই হয়। রাস্তা, যানবাহন ও যানচালক সংক্রান্ত কারণগুলিতে আমাদের দেশের অধিকাংশ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে বিভিন্ন ধরনের পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সরাসরি দায়ী যে পক্ষ তাদের সম্পর্কে ছোটো করে একটি তালিকা বানালে তা এরকম হবে।

লরি-দুর্ঘটনা: চালকের বেপরোয়া গাড়ি চালানো, অনেক চালকের নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গাড়ি চালানো, চালকের পরিবর্তে খালাসীর গাড়ি চালানো, গাড়ির বহু পুরানো লড়ঝড়ে ইঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

বাস-মিনিবাস দুর্ঘটনা : অন্য বাস, ট্রেকার না ম্যাক্সি-ট্যাক্সির সঙ্গে প্রতিযোগিতা, গাড়ির পুরানো ইঞ্জিন ও ব্যবহারের অযোগ্য রি-রিসোল করা টায়ার সামনের চাকায় লাগানো, ড্রাইভারের অনুপস্থিতিতে খালাসি দিয়ে বাস-চালানো, চালকের বেপরোয়া মনোভাব ইত্যাদি।

ট্রেকার বা ম্যাক্সি - ট্যাক্সি দুর্ঘটনা! — অত্যধিক মানুষ বা জিনিসপত্র চাপিয়ে গাড়ির ব্যালেন্স নষ্ট করা, বাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, ড্রাইভিং ঠিকমতো না জানা চালকের গাড়ি চালানো, ইত্যাদি।

মোটরগাড়ি দুর্ঘটনা ঃ —নেশাগ্রস্থ চালক , অত্যধিক গতিতে গাড়ি চালানো, পুরানো মোটর গাড়ি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে লরি চালকদের মোটর গাড়ির প্রতি বেপরোয়া মনোভাব।

দু - চাকার গাড়ি দুর্ঘটনা ঃ — উপযুক্ত রাস্তাঘাটের অভাব, নেশাগ্রস্থ চালক, হেলমেট ব্যবহারে চালক ও সঙ্গীর অনীহা এবং কোনো এক অজানা কারণে লরি চালকদের বাইকের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মনোভাব।

পথ দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য বিজ্ঞজন নির্দেশিত অনেক পদ্ধতি চালু আছে। এগুলি বাদে নুতন ধরনের কিছু প্রস্তাব নিয়ে ভাবলে কেমন হয়? প্রতি স্তরের সমস্ত ড্রাইভারদের ফটোসহ আইডেনটিটি কার্ড ল্যামিনেশন করে বুকে ঝুলিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক করা হলে অন্তত : ড্রাইভারদের বদলে হেল্পারদের বাস - মিনিবাস - লরি - ট্রেকার চালানো বা দাদার মোটর সাইকেল ভাইয়ের চালানোর মতো ব্যাপারগুলি অনেকটা কমানো যাবে। এছাড়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর ড্রাইভারদের —বিশেষত : লরি ও বাসের ড্রাইভারদের দৃষ্টিশক্তি, মাদকাসক্তি ও যৌনরোগের বিষয়ে সঠিক পরীক্ষা করাও জরুরি। এছাড়াও রাস্তাঘাটের উন্নতি করা এবং পুরানো গাড়ি চালানোর ব্যাপারে কড়াকড়ি করা দরকার ঠিকই , তবে সবার আগে দরকার লরি বা বাসের ড্রাইভারদের জন্য গাড়ির ডানদিকের আলাদা দরজা রাখার ব্যবস্থাটি বন্ধ করা। শুধুমাত্র এই প্রস্তাবটি মেনে নিতে পারলে অন্তত: শতকরা সত্তরটি সড়ক দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। নিজের জীবনের উপর থাকা মায়ার কারণেই চালকদের সচেতনতা অনেক বাড়বে, আর এই বাড়তি সচেতনতার প্রভাবে বেপরোয়া মনোভাব অনেক কমবে এবং এর ফলে পথ দুর্ঘটনা ঘটার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণগুলির অন্ততঃ শতকরা সত্তরভাগই দূর হয়ে যাবে। তবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই প্রথাটি বন্ধ করার কথায় নানা রকম প্রতিবাদ আসা স্বাভাবিক। ড্রাইভারের জীবনের মূল্যের কথাও উঠতে পারে। এক্ষেত্রে ভাবতে হবে যাত্রীদের জীবনের থেকে ড্রাইভারের জীবনের মূল্য বেশি বলেই বা আমরা ধরে নেব কেন? যে কোনো সময়, যে কোনো বিচারেই একজনের তুলনায় চল্লিশজনের জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তা ছাড়া এরোপ্লেনে আকাশ পথের যাত্রায় বা জাহাজে জলপথে যাত্রায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সমস্ত যাত্রীদের প্যারাশুটে বা লাইভবোটে চড়িয়ে না দিয়ে চালকের নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা অপরাধ বলে বিবেচিত হলে সড়কপথের যাত্রার ক্ষেত্রে একই ব্যাপার মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? আসুন, প্রস্তাবটি নিয়ে আমরা ভাবি, আলোচনা করি।

—

কালোবাজারির চাষ — গ্রাম ও শহরে

আমাদের স্বাধীনতা 'অর্জিত' হয়ে গেল এতদিন —অথচ একজনও কালোবাজারি ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসিতে ঝুলেছে বলে কোনো খবর আজ অবধি প্রকাশিত হল না (সেরকম কথা কিন্তু দেওয়া হয়েছিল!)। অথচ স্বাধীন ভারতের সরকারি উদ্যোগে বা সহায়তায় আমাদের দেশের গ্রামে ও শহরে বেশ কিছু নতুন ধরনের কালোবাজারি আর মহাজনি কারবার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। না, অসৎ ব্যবসায়ীদের চাল-ডাল, আলু-পেঁয়াজ, তেল-মশলা, বেবিফুড ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কালোবাজারি বা এযুগের কোনো সাইলককে নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় — সরকারি সহায়তায় যেখানে এই ব্যাপারগুলি ঘটে আর সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয়ের ব্যাপারটি চোখের আড়ালে থেকে যায় — সেরকম কয়েকটি ব্যাপার নিয়েই আজকের আলোচনা।

গরিব মানুষদের সস্তায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থা। এম.আর. ডিলারদের চালানো রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে গরিব মানুষদের কাছে এগুলি পৌঁছানোর কথা। সরকারি নিয়ম হল—ডিলাররা সরকারের গুদোম থেকে কেরোসিন, চিনি, গম, চাল ইত্যাদি নিয়ে এসে রেশন কার্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকার নির্দিষ্ট দরে এগুলি বিক্রি করবেন, আর এজন্য পরিবহন খরচ ও নির্দিষ্ট হারের কমিশন পাবেন। সরকার খোলাবাজার থেকে এসব জিনিসপত্র কিনে এক বিশাল পরিমাণ টাকা ভর্তুকি দিয়ে বাজার দরের থেকে অনেক কম দামে এগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই ব্যবস্থাটি চালু করেছিলেন। বাস্তবে কী ঘটছে? জাল রেশন কার্ড বা কেরোসিন বা চিনি-চালের মাপে-ওজনে কারচুপির কথা বাদই থাক — সাধারণ মানুষ জানতেও পারে না কোনো সপ্তাহে জনপ্রতি কী হারে কোনো জিনিস রেশনে আসে। রেশন দোকানদার (ডিলার) যা বলে — তাই মানুষ বিশ্বাস করে। ডিলাররা মাঝে - মধ্যেই বলে দেন অনেক কম মাল এসেছে, এই সপ্তাহে বা এই মাসে কোনো মাল আসেনি— ইত্যাদি। অথচ সরকারি নীল রং-এর কেরোসিনই হোক বা চিনি-গম — সবই বাজার মূল্যে কিনতে চাইলে এদের কাছে সবসময় পাওয়া যায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা কোচবিহারের মতো জেলাগুলির গ্রামাঞ্চলের মানুষের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে রেশনের দামেও এসব জিনিসগুলি কেনার মতো লোক প্রায় নেই বললেই চলে। এদের জন্য বরাদ্দ করা রেশনই বা কোথায় যায়? শোনা যায় অনেক ডিলার নাকি সরকারি গুদোম থেকে মাল তুলেই সঙ্গে সঙ্গে দালালদের পুরো মাল বেচে দিয়ে ভর্তুকির টাকাটা পকেটে পুরে বাড়ি এসে বলেন—মাল পাওয়া গেল না। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও জনগণের জন্য খরচ করা বিপুল পরিমাণ সরকারি ভর্তুকি জনগণের কাছে না পৌঁছে কিছু দালাল শ্রেণির মানুষের পকেটে যায়। এক্ষেত্রে এই শ্রেণিটি হল সরকার নিযুক্ত এম.আর. ডিলারগণের

একটি বড়ো অংশ। অবশ্য এদেরও খরচা আছে — সরকার ও পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ মাসোহারা এদের দিতে হয়।

বাঙালি তন্তুবায়দের আর্থিক সহায়তা করার জন্য সরকারি উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছিল নানা নামের তন্তুবায় সমবায় সমিতি। এগুলিতে একই শাড়ি বা বিছানার চাদর গল্পের কুমিরের ছানার মতো বারবার কেনা-বেচা চলে — আর মাঝখান থেকে ভর্তুকিটি কিছু ধান্দাবাজের পকেটে ঢোকে — এমন একটি ব্যবস্থা চালু এখানে। যেসব শ্রমিকের নামে সমিতিগুলি চালু করা হয়েছিল, তাদের জাল সই বা টিপছাপ মেরে জিনিসগুলি বারবার কিনে কাল্পনিক নাম ঠিকানার ক্রেতাদের কাছে সেগুলি বিক্রি করা হত। বছরের পর বছর এরকম করে সরকারি টাকা লুঠ করে একশ্রেণির দালাল কোটিপতি হয়ে গেছেন— আর তাঁতিরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই।

সরকারি অফিস-কাছারির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজার থেকে দাম-দস্তুর করে কেনার জন্য টেন্ডার ডাকা, মিনিমাম রেটে হিসেব করে প্রতিটি জিনিসপত্র কেনা-ইত্যাদি এমন সব অফিশিয়াল ঝামেলার ব্যাপার থাকে — যাতে এভাবে অফিসের সমস্ত খুটিনাটি জিনিসপত্র কেনা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। সেজন্য কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ নামধারী কিছু দোকানের সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের সরকার বাহাদুর বিশেষ কিছু অধিকার দিয়ে রেখেছেন। যেখানে কোনো অফিস খোলা বাজার থেকে কোনো জিনিস কিনলে তার বিলের টাকা সরকারি ট্রেজারী মারফত পাওয়া খুবই ঝামেলার ব্যাপার— অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব, সেখানে যে-কোনো জিনিস (আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট পর্যন্ত সবকিছুই) এইসব কনজিউমার্স দোকান থেকে কিনলে তার বিল পাশ করার ক্ষেত্রে সরকারি ট্রেজারি চোখ বন্ধ করে থাকে। অথচ এইসব দোকানে যে-কোনো জিনিসের দাম বাজারদরের অন্তত দেড় থেকে দ্বিগুণ। অন্য কোনো সহজ উপায় না থাকায় প্রতি বছর সমস্ত সরকারি অফিসের প্রায় সমস্ত জিনিস এই সব দোকানগুলি থেকে কেনা হয়, আর সরকারের কোটি কোটি টাকা কিছু মানুষের পকেট ভরতি করতে ব্যবহৃত হয়।

ভোট-নির্ভর রাজনীতিতে ভোটব্যাংক তৈরি করা ও তা সুরক্ষিত করে রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু লোকজনকে স্থায়ীভাবে কিছু পয়সা-কড়ি পাইয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করার একটি পদ্ধতি হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল ভর্তুকির মাধ্যমে বা অন্য কয়েকটি উপায়ে সরাসরি সরকারি টাকা পয়সা 'দান' করার এই পদ্ধতিগুলি। এরকম আরও বহু বিষয় আছে — যেমন গাড়িপ্রতি ১৫-২০ জন কর্মচারী নিয়োগ করে চালানো রাজ্য পরিবহন সংস্থা, যাদের গাড়িতে কোনোদিন কেউ নুতন টায়ার দেখতে পায় না। এদেশে যা হয় — সব বদমায়েশিকে আড়াল করে 'গরিব নিপীড়িত মানুষজনের স্বার্থরক্ষা'র মুখোশটি এক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

এবার কিছু বিশেষ ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীদের কথা আলোচনা করা যাক। যেমন - সাপ্তাহিক বেতন পাওয়া কোলিয়ারির শ্রমিকদের বেতন তোলেন কিছু সুদখোর মহাজন, শ্রমিকরা নিজেরা নন। মহাজন সেই বেতন থেকে মাসিক শতকরা ২০ শতাংশ হারে

সুদ এবং আসল টাকা কেটে রেখে বাকি সামান্য কিছু টাকা শ্রমিককে দেন। শ্রমিকদের হাতের ওই টাকাকটিও নেওয়ার জন্যে গুচ্ছের মদ দোকান আর জুয়া -দোকান খোলাই আছে। এসব জায়গায় টাকা গুলি খুইয়ে পরদিন থেকে শ্রমিক আবার মহাজনের কাছ থেকে ধার করে সংসার চালান। একই ঘটনা ঘটে আমাদের গর্বের খোদ রাজধানী শহর কলিকাতাতেও। কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিকদের অধিকাংশের অবস্থা একদম একই রকম। মাঝে একবার কথা উঠেছিল এসব শ্রমিকদের ব্যাংকে জমা দেওয়ার উপযোগী চেকে বেতন দেওয়ার — আর এই প্রস্তাব ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নানান রঙের রাজনীতির নেতারা রে রে করে তেড়ে এসেছিলেন। মধ্যস্বত্বভোগীদের এত বোকা ভাবা ভুল — এনারা নেতাদের ভাগ না দিয়ে কিছুই করেন না।

কলিকাতা বা হলদিয়া বন্দরের ডকে মাল তোলা-নামানোর জন্য যেসব শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন, তারা প্রতিদিন ২৫০-৩৫০ টাকা রোজগার করেন। শুনতে খুবই ভালো লাগে — শ্রমিকরা ভালো মজুরি পান। আসল অবস্থাটি আমরা কজন জানি? শ্রমিকদের 'কাজ' পাইয়ে দেয় যে ইউনিয়ন, সেই ইউনিয়ন অফিসের মাধ্যমে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নিতে হয়—আর সই করার পর খাতায় লেখা পারিশ্রমিকের অর্ধেক টাকা মাত্র শ্রমিকরা পান-বাকিটা শ্রমিক দরদি ইউনিয়নের কর্তাব্যক্তিরা রেখে দেন—'বৃহত্তর স্বার্থে কাজকর্ম করার জন্য'। বিশ্বাস হচ্ছে না? দয়া করে খোঁজ-খবর নেওয়ার পর অবিশ্বাস করুন।

—

বিজ্ঞানের জার্নাল, বিমূর্ত শিল্প আর আধুনিক কবিতা

আজকাল কিছু কিছু বিষয় এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে, যে সেই বিষয় সংক্রান্ত কোনোকিছুর অর্থ সম্পূর্ণ বুঝে তার রসগ্রহণ করার চেষ্টা কেবলমাত্র রস সৃষ্টিকারীরাই করতে পারেন, অন্যদের তা উপভোগ করার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, পরিবেশনের গুণে সাধারণত সেই চেষ্টাটুকুও তারা করতে পারেন না। এরকম একটি বিষয় হল আমাদের দেশে প্রকাশিত হওয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা - প্রশাখার সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকশো বিজ্ঞানের জার্নাল। এগুলি প্রকাশ করার ঘোষিত উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যে নিত্য - নতুন আবিষ্কার (Discovery এবং Invention) আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা করছেন, — তা প্রকাশ করা। কিছু কিছু চাকুরি আছে — যেখানে চাকুরি রক্ষা করার শর্তই হল এইরকম জার্নালগুলিতে প্রতিবছর নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু 'রিসার্চ আর্টিকেল' প্রকাশ করা। চাকুরির দায় হল পেটের দায়—এক বিষম বস্তু। সেজন্য এই ধরনের পত্রিকাগুলিতে (সবই প্রায় ইংরাজি ভাষাতে প্রকাশিত) যেভাবেই হোক এদের 'লেখা' প্রকাশ করতেই হয়। পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি পেতে গেলেও একই ধরনের প্রয়োজন পড়ে। একের প্রয়োজন অন্যের ব্যাবসার আসল মূলধন — সেজন্য এক একটি গোষ্ঠী নিজেরা চালান এরকম এক একটি জার্নাল — তাতে নিজেদের গোষ্ঠীর সদস্যদের 'আবিষ্কার' ও 'গবেষণার ফলাফল' প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানের এক একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশাখার উপরও কয়েকটি করে এরকম জার্নাল আমাদের দেশে প্রকাশিত হয়। এ-এক অন্যজগৎ—এখানেও আছে নিজস্ব ধরনের রাজনীতি। মৌলিক রিসার্চ আমাদের দেশে যা হচ্ছে, তার হদিশ আমরা অনেকেই জানি। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশ থেকে কেনা কেমিক্যালগুলি ব্যবহার করে বিদেশি জার্নালে আগেই প্রকাশিত হয়ে যাওয়া 'কাজ'গুলিকে নকল করে হয় আমাদের 'রিসার্চ', আর সেগুলির প্রতিবেদন এইসব জার্নালে প্রকাশিত হয়। অনেকে আবার এত ঝামেলাতে যান না, বিদেশি জার্নাল থেকে বিদেশি বিজ্ঞানকর্মীর কাজের ডাটাগুলিকে সরাসরি অথবা সামান্য হেরফের করে এদেশীয় ব্যাখা আর নতুন নামকরণ করে তা নিজের 'রিসার্চ পেপার' হিসাবে চালিয়ে দেন। কিছু কিছু জার্নালে আবার বিদেশের দশ-পনেরো বছর আগে হয়ে যাওয়া 'কাজ'-কে নকল করে 'পেপার' তৈরি করে তাও প্রকাশ করা হয়।

এতেই মজার শেষ হয়ে যায় না। যাদের লেখা এসব জার্নালে প্রকাশিত হয়, তাদের সাধারণত টাকা দিয়েই এগুলি ছাপাতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ব্যাপারে কোনো লুকোছাপার ব্যাপারও থাকে না। আর যাদের 'পেপার' এ সব জার্নালে প্রকাশিত হয়, তারা নিজেরাও কেবলমাত্র নিজেদের প্রকাশিত লেখাটুকুতে একবার চোখ বুলিয়ে জার্নালগুলি গুছিয়ে রাখেন—অন্য লেখকদের লেখাগুলোতেও একবার চোখ বোলান না। এইসব পত্রিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি অর্থে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কেনে, আর কেনেন লেখককুল। হয়তো অতি সামান্য সংখ্যক মানুষ এই দলে পড়েন না, তবে সাধারণভাবে 'সায়েন্টিফিক

জার্নালের' সঠিক অবস্থানটি আমাদের দেশে এইরকমই। রিসার্চের নামে এক বিশাল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয় আর কিছু কাগজ-কালির অপচয় ছাড়া আর কারোও অবশ্য এতে কোনো ক্ষতি হয় না।

একই কথা কি আধুনিক কবিতার নামে যা প্রকাশিত হয়ে চলেছে — তার অধিকাংশের ক্ষেত্রে মিলে যায় না? কবিতা ছন্দহীন হোক, তাতে কারও কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু পাঠকের কাছে তা কোনো অর্থ বয়ে নিয়ে যেতে না পারলে তাকে কীভাবে কবিতা বলা যাবে! লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তা - ভাবনা - কল্পনার ভাগ যদি পাঠক না নিতে পারেন, তাহলে তার সার্থকতা কোথায়? দৈনিক পত্রিকার যে-কোনো দিনের সম্পাদকীয় কলমকে কাঁচি চালিয়ে দুভাগ করে দুটো কবিতা বানানোর গল্পটি বোধহয় সবক্ষেত্রেই শুধুমাত্র 'গল্প' বলে মেনে নেওয়া যায় না, কখনও-সখনও তা প্রায় - উদাহরণ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

আজকের দিনে বিজ্ঞানের যে-কোনো বিষয়ে Specialisation এমন স্তরে পৌঁছে গেছে, সেখানে সেই স্তরের Specialised মানুষ ছাড়া অন্য কারওর পক্ষে বিষয়গুলি বোঝা কোনভাবেই সম্ভব হয় না — এটি এক স্বীকৃত সত্য। এ যেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এক বড়ো শহরের এক বহুতল বাড়ির বারোতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে আহত হওয়া সেই মানুষটির মতো—যার চিকিৎসার জন্য পাঁচটি হাসপাতাল ঘুরেও উপযুক্ত Specialist পাওয়া যায়নি। এক থেকে পাঁচতলা, পাঁচ থেকে দশতলা, পনেরো থেকে কুড়িতলা ইত্যাদি থেকে পড়ে যাওয়া রোগীর জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এই রোগীর চিকিৎসা করতে চাননি, আর দশ থেকে পনেরো তলার মাঝখান থেকে পড়ে যাওয়া রোগীদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু সেদিন ছুটিতে থাকায় রোগীর বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া ছাড়া অন্য পরিণতি পাওয়া সম্ভব ছিল না। এটি একটি নিছক গল্প; কিন্তু বিমূর্ত শিল্প, আধুনিক কবিতা ও সাহিত্যের অন্যান্য কিছু দিকগুলির অনুসারীরাও যদি সবাই এরকম 'বিশেষজ্ঞ' হওয়ার রাস্তাতে হাঁটাকেই কর্তব্য বলে মেনে নেন, তবে কেবলমাত্র দুর্বোধ্যতার কারণেই তা সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কাছেও পৌঁছতে পারবে না। এটাই কি অভিপ্রেত ?

—

গ্রাম বাংলার চালচিত্র

ইংরেজ শাসনে থাকা বাংলাভাষী অধ্যুষিত রাজ্যটির গ্রামগুলিকে অতীতে গ্রামবাংলা বলা হত, তবে আজকের আলোচনা শুধুই সীমান্তের পশ্চিমের 'এপার বাংলা' অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে। বিরাট এই রাজ্যটির এক জায়গার সঙ্গে অন্য জায়গার ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, নৃতত্ত্বগত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ফারাক অনেক, মিল শুধু এক জায়গায় — এক ব্যাপক অংশের মানুষের দারিদ্র্যে। গ্রামবাংলার হালচাল বোঝার জন্য গ্রাম্য মানুষজনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বোঝাই যায় না আজকের গ্রাম কতটাই সঠিক অর্থে গ্রাম আর কতটাই বা বঙ্গ -সংস্কৃতি ধারণ-বহন করে চলেছে। সর্বত্রই এক 'জগা-খিচুড়ি' অবস্থা। আধুনিক টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা,মিডিয়ার প্রভাব বা বিজ্ঞাপন নির্ভর সংস্কৃতি — এগুলির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম আর গ্রাম থাকছে না। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গা আজও দুর্গম, তবে 'পাড়া - গাঁ' নয়। অধিকাংশ গ্রামের মধ্যেই একটি করে বাজার তৈরি হয়ে গেছে, যেখানে গত পরশু টেলিভিশনে দেখানো নতুন ভোগ্যপণ্যটিও আজ পাওয়া যায়। তবুও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সঠিক অবস্থাটি বোঝার চেষ্টা করতে গেলে এতসব জানা - বোঝা সবই ওলট-পালট হয়ে যায়।

সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমরাও সবাই দূষণ নিয়ে চিন্তিত। মিডিয়ার কল্যাণে দূষণ নিয়ে প্রতিদিন নানান খবর জানছি, আর বায়ু দূষণ, শব্দদূষণ, জলদূষণ, খাদ্যদূষণ- এই সব দূষণ নিয়ে নিত্যদিন কত গুরুগম্ভীর আলোচনা - সমালোচনা কানে আসছে। আসলে মিডিয়া যা শোনায়, আমরা তা শুনতে বাধ্য,যা বোঝায় আমরা তা বুঝতে বাধ্য, যা যেভাবে জানায়, আমরা কেবলমাত্র সেভাবেই তা জানতে বাধ্য। কাজেই দূষণ নিয়ে সত্যিকারের মাথাব্যথা না থাকলেও যতদিন 'পাবলিক খাবে' ততোদিন দূষণ নিয়ে মিডিয়ার নির্দিষ্ট রকম প্রচারটিও থাকবে। কিন্তু মিডিয়াগুলো পরিকল্পিত ভাবে সবচেয়ে মারাত্মক যে দূষণগুলি ছড়ায়, তার কথা হুট করে মনে আসে কি? গণতান্ত্রিক দেশে মিডিয়া একটি বিরাট-বিশাল ব্যাপার। সত্যিই বিরাট ব্যাপার। তবে কলকারখানার শ্রমিক থেকে গ্রামের চাষি-সমস্ত অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষজনকে 'দেশি'র রসে মজিয়ে ভুলিয়ে রাখার পরিপূরক হিসাবে 'গণতন্ত্রের মেরুদণ্ডের' এখন কাজ হয়েছে মুনাফা লাভের জন্য শিক্ষিত (?) মানুষজনকে 'রসে' মজিয়ে রাখা। মিডিয়ার ছড়ানো দূষণগুলি বোঝার জন্য খুব বেশি ভাবনা-চিন্তা করার দরকার নেই। আগে থেকে কোন ধারণা তৈরি করা না থাকলে শুধুমাত্র যে কোনো দিনের খবরের কাগজ বা টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটি সহজে বোঝা যায়। প্রথমে সংবাদপত্রের কথাই ধরা যাক। নীতিহীন রাজনীতি ব্যবসায়ীদের প্রতিদিন খবরের শিরোনামে থাকার উদ্দেশ্যে বলা 'বাণী'

সমূহের প্রচার করা বা ওনাদের 'জার্সি' বদলের মতো করা দলবদলের খবরাখবর প্রকাশ করা, রূপোলি জগতের নায়ক-নায়িকাদের বাস্তব-অবাস্তব কেচ্ছার প্রকাশ করে ওনাদের জনপ্রিয়তা ধরে রাখার চেষ্টা করা, নাবালিকা ধর্ষণ অথবা গৃহবধূর সম্ভাব্য অবৈধ সম্পর্ক থেকে হওয়া খুন - খারাবির মতো মুখরোচক খবরের রগরগে বর্ণনা বা আজকাল প্রায় গা সয়ে যাওয়া রক্তাক্ত রেল বা বাস দুর্ঘটনার সচিত্র সংবাদ - এরকম কিছু খবর (খাদ্য) সরবরাহ করাই অধিকাংশ সংবাদপত্রের দৈনন্দিন কাজ। আর বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা? এর জন্য তো মাইনে -পোষা সাংবাদিক আছেন পাঠক টানার জন্য। বাংলাভাষায় কয়েকটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের ততধিক বিখ্যাত এরকম কয়েকজন সাংবাদিক আছেন, যারা গত কয়েক বছর ধরেই ১) মুক্ত অর্থনীতির নামে সমস্ত সরকারি কল-কারখানা - প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে কোনো মূল্যে নির্বিচারে বেচে দেওয়া উচিত, ২) ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি যা করছে সবই ঠিক, সেজন্য কেন্দ্র ও রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা থাকা উচিত, ৩) স্বেচ্ছাচারী আচরণ বা বিকৃত কদাচার বলে কিছু হয় না- এ সবই সুস্থ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে - যারা অন্যরকম কিছু মনে করেন তারা সবাই মুর্খ, ৪) বিখ্যাত সমস্ত 'ভারতীয়' মহাপুরুষই ভণ্ড, ৫) হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত সবকিছুকে কারণে-অকারণে গালাগালি দেওয়া হল ধর্ম-নিরপেক্ষতা, আর হাজারও অন্যায়-অবিচারের উৎসকেন্দ্র আর সামাজিক সমস্যার জন্মদাতা হলেও সংখ্যালঘু মানুষের পালন করা কোন ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের বিকৃত মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে কোনো সমালোচনা করলে তা হল সাম্প্রদায়িকতা। ৬) নারী মাত্রেই ক্রয়যোগ্য পণ্য, আর পুরুষমাত্রেই অত্যাচারী- এইরকম কিছু 'মতবাদ' প্রচার করার জন্য নানা কায়দায় নানা রকমের মুখোশ পরে বেশ বীর-বিক্রমে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। পাবলিক প্রায় সবাই এগুলিকে দৈববাণী মনে করে খেয়ে হজম করছে-আর সামান্য দু-একজন প্রতিবাদ করে চিঠি লিখছে পত্রিকা দপ্তরে। এইসব চিঠির মধ্যে আবার যেগুলি প্রকাশ করলে কলমচিদের মূর্খামি ধরা পড়ে যাবে - সেগুলি বাদ দিয়ে হালকা দেখে দু-একটা চিঠি প্রকাশও করা হচ্ছে 'প্রতিবেদকের উত্তর' সহ। (মাইনে পোষা প্রতিবেদক ভুল-ভাল তথ্য সহযোগে 'উত্তর' দিলেও সেই 'উত্তর' - এর প্রতিবাদ কখনও ছাপা হয় না!) । সব মিলিয়ে পত্রিকাগুলির ব্যাবসা বাড়ছে, সরকারি আনুকূল্যে থেকে বিপুল অর্থের বিজ্ঞাপন পেয়ে রোজগারও বাড়ছে!

দূরদর্শনের দর্শকদের একটা বড়ো অংশ হল শিশু ও কিশোর। এদের কথা ছেড়েই দিলাম, একদম বাচ্চাদের জন্য প্রচার করা কার্টুন জাতীয় পোগ্রামগুলির ফাঁকে ফাঁকে প্রচার করা বিজ্ঞাপনগুলিতে কি সব দৃশ্য দেখানো হয়? চব্বিশঘণ্টার উলঙ্গ নৃত্যের ড্যান্স চ্যানেলগুলি ছেড়ে দিলেও সাধারণ চ্যানেলগুলিতে প্রচারিত হওয়া বিজ্ঞাপনগুলিই বা কেমন? বিশেষ কোম্পানির মিন্ট লজেন্স আপনি কেন খাবেন তা জানতে চাইলে পানের ডাব্বায় আপনার মুণ্ডু চোবানো হতে পারে। বিশেষ কোম্পানির শেভিং ক্রিম দিয়ে দাড়ি

কামালে গালে ঘসে দিয়াশালাই কাঠি জ্বলবে না, তবে সুন্দরী মহিলাদের চুল কামানো বগলে ঘসলে তা জ্বলবে। বিশেষ ধরনের চর্বি কমানোর যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে তা জানতে হলে সুতো - ফিতে পরা সুন্দরীদের, উরু, পেট, বুক,- এসব দেখে তবে তার ব্যবহার বুঝতে হবে।সাবান, অন্তর্বাস বা মহিলাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের কোনো বিজ্ঞাপন উলঙ্গ নারীদেহ দেখানো ছাড়া সম্ভব বলে বোধ হয় কোম্পানিগুলি মনে করে না। নেহাত কুৎসিত দেখাবে সেই ভয়ে অথবা আইন রক্ষকদের সম্মানার্থে এসব ক্ষেত্রে শরীরের উপর সামান্য দু-এক টুকরো সুতো-ফিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আর ক্রেতাদের মগজে সঠিক তথ্য কোনোভাবে ঢুকে গিয়ে মনের মধ্যে যদি প্রশ্ন জাগে- ঠান্ডা পানীয়টি কেন খাব? - উত্তর - এসব জানার দরকার নাই 'শুধু স্বাদ, জ্ঞান বাদ'। সংবাদপত্র, দূরদর্শন চ্যানেলসহ সমস্ত মিডিয়াই তো ব্যবসা করার জন্য নেমেছে, তাই একে অপরকে টপকে যাওয়াই যে-কোনো মিডিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির একমাত্র লক্ষ্য। সেজন্য এদের সবারই একমাত্র উদ্দেশ্য আর্থিক লাভ - সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যা যা করা দরকার - এরা কেবলমাত্র তাই করবে। এই উদ্দেশ্যে করে যাওয়া কাজকর্মগুলির ফলে ব্যক্তিমানুষ বা সমাজ - এদের কী হল বা কী হল না তা নিয়ে সংস্থাগুলির সত্যিকারের কোনো দায় বা মাথাব্যথা নেই, অন্তত সংস্থাগুলি চালানোর জন্য নিযুক্ত মাইনে -পোষা কর্মী ও এদের মালিকগোষ্ঠী - এরা এমনটাই ভাবেন। এই ভাবনার ওপরে চড়ানো মুখোশ হিসাবে এনারা কী কৌশল নিলেন বা মুখে কী বললেন সেগুলির সত্যিকারের কোনো গুরুত্ব নাই।

মিডিয়ার এহেন প্রভাবেই মজে আছি আমরা। (বিচক্ষণ, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীরা!) এগুলির প্রভাব তাহলে অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষজনের ওপর আর শিশু-কিশোরদের ওপর কতটা হতে পারে তা নিয়ে কারর কোনো চিন্তাভাবনাই নাই। কিছু না হোক মিডিয়ার কল্যাণে বাঙালির নীতিবোধের মধ্যে ইতিমধ্যেই দারুণ আধুনিকতা এসে গেছে। এখন সচ্ছল মধ্যবিত্ত বাড়ির কলেজ হোস্টেলে থাকা লাজুক ছেলেমেয়েদের মধ্যেও কারও কারও মধ্যরাতের অ্যাডভেঞ্চারের ফল স্বরূপ AIDS হচ্ছে। মফসসল থেকে কিছু বাড়তি রোজগারের উদ্দেশ্যে আধুনিকা তরুণী গৃহবধূদের দুপুরবেলা বড়ো শহরে চাকুরির নামে বেরিয়ে পড়ে ভাড়া খাটতেও আপত্তি নেই। প্রশ্নটা আর্থিক অনটনের নয়, প্রশ্নটা মানসিকতার। অবশ্য মিডিয়াগুলোর মতে মানুষের 'যৌন স্বাধীনতা' নিয়ে 'জ্যাঠামশাই ' গিরি করার অধিকার কারওর নেই। প্রচারের এই বিপুল উচ্ছ্বাসের মধ্যে স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ির ড্রয়িংরুমের টেবিলে বাঁ হাতে হুইস্কির গ্লাস হাতে বসে থেকে থেকে 'জ্ঞান' উদগীরণ করা ক্ষমতাশালী সব কলমের বিরুদ্ধে লড়াই করা তো দূরস্থান। মিডিয়ার এইসব মানুষজন গ্রামকে-দেশকে সঠিকভাবে জানবে, গ্রামের সমস্যাকে গুরুত্ব দেবে- এতটা আশা করাটাই তো মূর্খামি।

গ্রাম্য রাজনীতির কথায় আসা যাক। এই ব্যাপারটির বিস্তার বিশাল, আর তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ধরনও তাই বিভিন্ন রকম। যেমন- একটি গ্রামের যে পাড়াটিতে যে রাজনৈতিক দল 'ওজনে ভারী' সেখানে সেই দলের দালাল - তা তিনি আকাশফোঁড় বা ভুঁইফোঁড় -- যে ধরনেরই হোন না কেন - তিনিই ভগবান। গ্রামের রাস্তা মোরাম হবে বা পাকা হবে? ঠিক আছে। সর্বদলীয় বেনিফিসিয়ারি কমিটি গঠন করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলির গুরুত্ব অনুযায়ী ওই অঞ্চলের সবদলের এরকম কয়েকজন দালাল নিয়ে তৈরি হবে কমিটি। হরির লুঠের বাতাসা ছড়ানোর মতো করে ছাড়ানো মোরাম বা বিটুমিনের গন্ধ দিয়ে মাখানো পাথরকুচি কয়েকটা ছড়িয়ে- মাড়িয়ে দেওয়ার খরচ ও রাজনৈতিক দল, সরকারি ওভারসিয়ার, বিলপাশের বড়োবাবু ইত্যাদির অংশ মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে কনট্রাকটরদের এই টাকার একটি বড়ো অংশ রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অনুযায়ী কমিটির দালালদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয়। একই ভাবে সরকারি বনসৃজন প্রকল্পের সারা ব্লকের লক্ষ লক্ষ টাকার গাছপালা 'নীলামে' 'বিক্রি' হয় দু-তিন হাজার টাকায়। আর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির প্রাপ্য লোনের একটি অংশ অগ্রিম উপঢৌকন দিতে পারলে বাকি অংশটি প্রাপককে 'পাইয়ে' দেওয়া হয়। (লোন আর অনুদানের কোনো অর্থগত পার্থক্য গরিব অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের ইচ্ছে করেই বোঝানো হয় না।) এই ভাবেই হয় গ্রামবাংলার 'ডেভলাপমেন্ট' খাতে কোটি কোটি টাকার বার্ষিক খরচ। ভাগাভাগি নিয়ে কি গোলমাল বাধে না? অবশ্যই বাধে, আর তখনই তো এইরকম কিছু 'খবর' বেরিয়ে এসে মিডিয়াকে কিছু খাদ্য উপহার দেয়।

গ্রামের মানুষজনের আসল জীবিকাগুলি তো চাষবাস নির্ভর। পশ্চিমবঙ্গের চাষ মানে তো ধান চাষ আর আলু চাষ। পাটের বাজার নেই, তাই চাষও না থাকার মতো। পান চাষ বা শাক - সবজি, তামাক , ফুল বা ডাল- সর্ষের চাষও খুব কম জায়গায় হয়। অনুন্নত উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গার জমিই আলু আর বাদাম চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত - তবে এসব চাষ নিয়ে চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা বা অনুসারী শিল্পের ব্যবস্থা করা - এসব ব্যাপার নিয়ে কার মাথা ঘামানোর সময় নেই। যাই হোক, জমি তৈরি, ফসল ফলানো ও পরে তা বাড়ি এনে গোছান -এরকম বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য জমির মালিকের বা চাষির প্রয়োজন থাকে শ্রমিক বা দিনমজুরের সাহায্য। তবে চাইলেই বা পারিশ্রমিক দিলেই ইচ্ছুক শ্রমিক পাওয়া যাবে নাকি? কোন চাষির বাড়ি কোন শ্রমিক দিনমজুরী করতে যেতে পারবে, তা ঠিক করতে সব পাড়াতেই আছে মাতব্বর গোষ্ঠী। ভোট রাজনীতির কল্যানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির উস্কানিতে এরকম গ্রাম্য মাতব্বর গোষ্ঠী তৈরি হয়, আর ক্রমশ 'তোল্লা' দিয়ে দিয়ে এদের ক্ষমতাশালী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ভোটের সময় এদের ক্ষমতার ওপর তো নির্ভর করতেই হয়। নেতা হিসেবে অবশ্য পঞ্চায়েত মেম্বার বা প্রধান হওয়া

অবধি এনাদের লাগাম ছাড়া থাকে, আর এই সীমানার মধ্যে এরা সবাই এক একজন হিটলার। (উপরে ভগবান, নীচে অঞ্চল প্রধান - গ্রাম্য প্রবাদ!) এনাদের নির্দেশ জোগাড় করতে পারলে শ্রমিক তো পাওয়া যাবে, কিন্তু কাজ কতটা পাওয়া যাবে? অন্যের জমিতে দিনমজুরি খাটতে গেলে শ্রমিকরা গড়ে কাজ করেন ঘণ্টা তিনেক, আর বাকি সময়টা বিড়ি আর গল্পে যায়। খুব ভদ্রভাবে যদি জানতে চান 'কেন এমন করেন ভাই?' উত্তর হবে 'কেন? ইস্কুলের মাস্টার, সরকারি অফিসের লোক - এরা কী আমাদের থেকে বেশি কাজ করে নাকি? আমরা মাঠে বসে থেকে আর কটা টাকা পাই, চেয়ারে বসে ওনারা ?' ---আলসেমি, ফাঁকিবাজির বিস্তৃতি আর 'গণতন্ত্রিকরণ' ছাড়া একে আর কি বলা যায়?

গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত চাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখন খুবই খারাপ। একদিকে ঠাট-বাট আত্মীয়তা বজায় রাখার চাপ আর অন্য দিকে জল-সার - বিষ - দিনমজুরীর খরচ মেটানোর পরে অনিশ্চিত ফসল উৎপাদন, যা আবার উৎপাদন খরচের চেয়েও কম দামে অনেক সময় বিক্রি করতে বাধ্য হতে হয়। মুরশিদাবাদ জেলায় একটাকা জোড়া বাঁধাকপি - ফুলকপি বা হুগলি- মেদিনীপুরে টাকায় দু'কিলো আলু বিক্রি হলে তা কোনো 'খবর' নয়। আট - দশ টাকা কিলোগ্রাম দরে চাল কিনে শহরবাসীরা খুব খুশি, আর যারা এই ফসল উৎপাদন করছে , নায্যমূল্য না পেয়ে তারা কীভাবে আছে তার খোঁজ রাখাটা শহুরে মিডিয়ার কাছে অপ্রয়োজনীয়। (অন্ধ্রপ্রদেশের তুলোচাষিদের আত্মহত্যা করা নিয়ে অবশ্য অনেক লেখালেখি হয়!) নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে ফেলা এই মানুষগুলি আসলে গরিবেরও গরিব। মানুষগুলি সংগঠিত নয়, বোকাও আবার নাচারও। এখন তো আবার খোলা বাজার অর্থনীতিতে বিদেশে ভর্তুকিতে চাষ করা ও আমাদের দেশে আমদানি করা বিদেশি শস্যের সঙ্গে লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে ওই শ্রেণির মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। অথচ মোটামুটি শিক্ষিত; পূর্বতন মধ্যবিত্তদের এই শ্রেণিই অতীতে গ্রামবাংলার গৌরব ছিল। এই শ্রেণির মানুষজনের মধ্যেই বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্ব জন্মেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রামে রাজনৈতিক মেরুকরণ এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে সুস্থ চিন্তার শিক্ষিত এই শ্রেণির মানুষ আর গ্রামে তিষ্ঠোতে পারছেন না। একে তো গ্রামের অসুস্থ পরিবেশ - তার উপর গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে পড়াশোনার যা হাল - তার উপর সমস্ত ভরসা এনারা হারিয়ে ফেলেছেন। এনাদের একদল ন্যায়-অন্যায় বোধকে মগজ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রামে থাকছেন, আর এর মধ্যে যাদেরই একটু আর্থিক সঙ্গতি আছে - তারা গ্রাম ছেড়ে যে কোনো মূল্যে শহরবাসী হতে উদ্‌গ্রীব। বড়ো চাকুরিজীবী সচ্ছল মানুষদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, প্রাইমারি - শিক্ষক বাড়ি থেকে সাইকেলে প্রতিদিন স্কুলে যান, বাড়িতে তিন - চার বিঘে কৃষি-জমি আছে, এমন মানুষও চাষের জমি, ভিটে মাটি সব বেচে দিয়ে সেই টাকায় শহরে এককাঠা জায়গা কিনে লোন নিয়ে ছোটো একটা বাড়ি করে

বসবাস করতে চাইছেন। জেলাসদর, না হলে মহকুমা শহর অথবা নিদেন পক্ষে ব্লক টাউনের অধিবাসী হওয়াটাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বানিয়ে ফেলেছেন এনারা। শহরের ওপর তাই চাপ বাড়ছে - জমির দামও বাড়ছে হু হু করে। এদিকে শিক্ষিত - মধ্যবিত্ত বা চাকুরিজীবী শ্রেণি গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় গ্রামগুলির অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হয়েই চলেছে। স্বঘোষিত নেতা, দালাল ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের শ্রেণি আর চব্বিশ ঘণ্টার মাতাল, জুয়াড়ি, বৌ ঠেঙানো - ভোট বাড়ানো মানুষজনের শ্রেণি - এই দুই শ্রেণি ছাড়া আর কারর গ্রামবাংলাতে বাস করার সম্ভাবনা আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছে। সেজন্য নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির নাচার কিছু মানুষ আর নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষই কেবল পড়ে থাকছেন গ্রামে। এই শ্রেণির মানুষদের বর্তমান প্রজন্ম আবার বাবা-মায়ের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম। এরা কথাবার্তা, বোলচাল পোশাক - আশাক— সবকিছুতেই নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে শহুরে হতে চায়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন সংখ্যার যোগ-বিয়োগ করতে না জানা মানুষও পি.এইচ.ডি ডিগ্রি পেতে পারে। কাজেই বাবার সাধ্যের বাইরে খরচ করিয়ে এদের তথাকথিত 'শিক্ষিত' বেকারে পরিণত হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এই 'শিক্ষিত' ছেলেমেয়েরা মাঠে গিয়ে চাষবাস দেখাশোনা করার মতো ছোটো কাজ করা পছন্দ করে না। চাষে খেটে কি লাভ? তাই প্রয়োজন রোজগারের সহজ পথ, এমন চাকুরি যেখানে কোনো কাজ করতে হবে না। যতদিন সেরকম কিছু না পাওয়া যায়, ততদিন বাজারের ঠেকে বসে উৎপীড়িত বাবার পয়সায় চা-সিগারেট-তেলেভাজা চালিয়ে রাজা-উজির হত্যা করা আর ইলেকশনের সময় ভোটারদের সন্ত্রস্ত করে রাখা, বুথ জ্যাম করা, জাল ভোট দেওয়ার মতো 'ডিউটি' করে উপরি রোজগারের ধান্দা করাই এনাদের কাজ। তাছাড়া বছরের অন্য সময় নেশা আর গুন্ডামিতে হাত পাকানোর জন্য দাদারা পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবঘরও তো তৈরী করে দিয়েছেন।

গ্রাম বাংলার তিন-চার বিঘে কৃষিজমির মালিকই এখন 'মালিকপক্ষ' — অন্তত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে সেই রকম বুঝিয়ে এদেরই দিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের উপর শোষণ চালানোর কাজে যারা দালাল - সেইসব ক্ষমতাধারী 'নেতা'রা মানুষের দৃষ্টি আসল দিক থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুচতুর পরিকল্পনার মাধ্যমে এই কাজটি করেন। এতে দু-ধরনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। একে তো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সামনে একটা 'শত্রু'র ছবি ঝুলিয়ে দিয়ে তার দিকেই তাদের সমস্ত মনযোগ ধরে রাখতে বাধ্য করে নিজেদের দেশি-বিদেশি ব্যাংকে জমানো কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স, বেনামীতে চালানো বাস -লরি-হোটেল-প্রোমোটারি ব্যবসা বা নিজেদের বিলাস-বহুল জীবন যাপনের দিকটি চোখের আড়ালে রাখা যায়, আবার এদের বিরুদ্ধে কিছুদিন অন্তর অন্তর স্থানীয়ভাবে একটা করে ইস্যু তৈরি করে মানুষকে সেই ইস্যুতে মাতিয়ে রেখে নিজেদের 'ভোট ব্যাংক' সুরক্ষিত রাখা যায়। এই একই উদ্দেশ্যে অনেক সময় নিজস্ব টি.ভি চ্যানেল খুলে তাতে দারুণ গুরুত্ব দিয়ে

সিরিয়াল তৈরি করে মানুষকে দেখানো হয় সাধারণ অপরাধের বিষয়গুলি- যেমন পণ নিয়ে বধূ নির্যাতন ও বধূ হত্যা, সম্পত্তি নিয়ে খুন ইত্যাদি নানা ঘটণা, আর এভাবে মানুষের চোখের আড়ালে রাখা যায় নিজেদের মস্তান বাহিনীর নানা কীর্তিকলাপ—গণ ধর্ষন, গণ ডাকাতি, গণ লুঠ থেকে গণ হত্যা - সব কিছু। অনেক ধুরন্ধর মস্তিষ্ক থেকে এসব পরিকল্পনার উদ্ভব হয়- সাধারণ মানুষের সাধ্য কি এর স্বরূপ বোঝেন!

গ্রামবাংলার মহিলাদের অবস্থা কী? সাধারণ স্বাস্থ্যজ্ঞানটুকুও না থাকায় কৃমিভরতি পেট,নানান চর্ম ও স্ত্রীরোগ, ক্রনিক অ্যাসিডিটি ও আমাশয় রোগ ধারণ করে এনারা বেঁচে আছেন। আর খাওয়া- দাওয়া? মাতাল স্বামীর হাতের কিলচড় আর চ্যালাকাঠের বাড়ি বাদ দিয়ে আর যা জোটে তা হল দুবেলা অবেলায় আধপেটা ফেনভাত। মাঝেমধ্যে অবশ্য 'মেলাঘাটের ভালোমন্দ' (অখাদ্য - কুখাদ্য) খাওয়াও জোটে। পেটে ভাত বা শরীরে রক্ত না থাক মিডিয়ার কল্যানে সুরূপা হওয়ার একমাত্র দাওয়াই হিসেবে নামি-দামি কোম্পানির লিপস্টিক, গালে - মুখে প্রলেপ লাগানোর ল্যানোলিন-গ্লিসারিন-প্যারাফিনের নানান রকম কৌটো আর হাত পায়ের নখে লাগানোর পালিশের বোতল আধপেটা খেয়ে থাকতে হলেও কিনতে হয়। চিকিৎসা করানোর পয়সা নেই, অসুস্থ হলে সংস্কারই ভরসা। রক্তহীন ক্ষীণজীবী শরীরের অসুখবিসুখ আর দুর্বলতা কী মাদুলি-তাবিজ বা শেকড়-বাকড় লাল সুতোতে করে বেঁধে গলায়, কোমরে বা কব্জিতে ঝুলিয়ে রাখলেই শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোরে সেরে যাবে?

আজকের বঙ্গজননীরা রক্তে শতকরা ৪-৫গ্রাম হিমোগ্লোবিন নিয়ে বছর বছর ভবিষ্যতের বীর সন্তান প্রসব করে চলেছেন। শাড়ী জড়ানো সব জীবন্ত কঙ্কাল দেখে কিশোরী, তরুনী, যুবতী আর বৃদ্ধাদের পার্থক্য বোঝা যায়না। গরীব বাড়ীর কুরূপা মেয়েদের অবশ্য বিহার - উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা অজানা - অচেনা 'বরেদের' সাথে 'বিয়ে ' হয়ে যায়, তাতে বিয়ের 'ঘটক' ও মেয়ের বাবার হাতে কিছু অর্থাগমও হয়। এরপর ঐ মেয়েগুলোর কোন খবর কেউ জানতে পারেনা,তবে মহানগরীগুলোর রেড লাইট এলাকাতে খুঁজলে এদের খবর অবশ্যই পাওয়া যাবে। এই হল গ্রামবাংলার প্রতিদিনের সাধারন চিত্র। জল মেশাতে মেশাতে জলময় হয়ে যাওয়া সরকারী পরিসংখ্যানে এর হদিস কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

মেয়েদের উপরে পণ নিয়ে, বারবার কন্যা সন্তান প্রসব করা নিয়ে এবং যৌন - নিগ্রহের অধিকার নিয়ে কতরকম অত্যাচার যে গ্রাম বাংলায় হয়, তার কোনো সীমা - পরিসীমা নেই। একে তো স্বভাব- ভীরু, তায় নানা কুসংস্কারে ভরা মন নিয়ে এগুলির বিরুদ্ধে একা একা প্রতিবাদ করার সাহস অর্জন করা প্রায় কোনো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব হয় না। ফলে আত্ম-নিগ্রহ এবং ক্ষেত্র বিশেষে আত্মহত্যাতে গিয়ে ঘটনাক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটে। অথচ বাঙালিরা নাকি সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে 'সচেতন' জাতি। জানি না

চেতনা কাকে বলে। গ্রামবাংলায় কোনো প্রতিবাদী ব্যক্তির উপস্থিতি চোখে পড়ে না, কিংবা হয়তো নানান অত্যাচারের ভয়েই এইসব মানুষেরা ঘরের মধ্যে থেকে বাইরে বেরোতে সাহস পান না। আর আইনের সাহায্য নেওয়া? কোন মেয়ে যদি খুব সাহস করে আইনের রক্ষাকর্তাদের কাছে পৌঁছতেও পারেন, কতজন আইন রক্ষক অফিসারের এমন মেরুদণ্ড আছে যে অভিযোগকারিণী ও অভিযুক্তদের রাজনৈতিক রং না দেখে, রাজনীতির স্থানীয় মাতব্বরদের অনুমতি না নিয়ে ডায়েরি নেবেন?

নারীর অধিকার রক্ষা করার জন্য কিছু শহুরে ঘুষখোর বড়ো বড়ো চাকুরে বা কলোবাজারি-ভেজালদার ব্যবসায়ীদের বগল কাটা ব্লাউজ পরা, ববকাট চুল, আর লিপস্টিক লাল ঠোঁটের সবজান্তা বউরা নিজেদের নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহিলা সমিতি-ফমিতি গড়ে এমন ভাব দেখান যেন সমাজ ভরা অত্যাচারীদের মাঝে ওনাদেরই একচেটিয়া দায়িত্ব আর অধিকার আছে মেয়েদের ব্যাপারে কথা বলার। এসব সমিতিগুলি আসলে ক্ষমতালেহী এক একটি রাজনৈতিক দলের মহিলা - লেজুড় (ছাত্র লেজুড়, যুব-লেজুড়, শ্রমিক- লেজুড়, কৃষক- লেজুড় ও সরকারি কর্মচারি - লেজুড়ের মতো), সেজন্য এনাদের কাছে মহিলাদের উপর কেউ অত্যাচার করলে তিনি 'অত্যাচারী 'কিনা তা নির্ভর করে তার রাজনৈতিক রং-এর উপরে। অন্য দলের ভোটারদের করা অত্যাচারটি অত্যাচার ,আর নিজ দলের কেউ এসব ব্যাপারে জড়িত থাকলে তা 'বিরোধীদের অপপ্রচার'। সুতরাং সেই ব্যাপারে খোঁজ খবরটুকু নেওয়াও তাই অপ্রয়োজনীয়। এনারা অনেকেই সারাজীবনে কোন গ্রামই দেখেননি, ধান গাছের কাঠ দিয়ে গ্রামে বাড়ী তৈরি হয় বুঝিয়ে দিলেও বিশ্বাস করে নেবেন। এনারা হবেন গ্রামের অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের সমব্যাথী? এনারা বোঝার চেষ্টা করবেন এইসব মেয়েদের সত্যিকারের সমস্যা? তাহলে যৌন - স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা আর নিজেদের দিকে ঝোল টানার সুবিধাবাদ অর্জনের লড়াই - এসব করবেন কখন?

মানুষ নিজের দুরাবস্থার কথা স্থিরমস্তিস্কে বুঝতে পারলে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে, সুতরাং সেই পথে যাতে মানুষ যেতে না পারে তার জন্য কিছু সুচিন্তিত ব্যবস্থা তো নিতেই হয়। প্রতিবাদ - প্রতিবাদ খেলা, ছোটো বড়ো মিটিং ডেকে গরম-গরম বুলি ছড়িয়ে পাবলিককে সবসময় গরম রেখেও যদি ভুলিয়ে না রাখা যায়,তখন ভোলানোর অন্য রাস্তা আছে। 'বারোমাসের তেরো পার্বণের' এই বাংলায় উৎসব অনুষ্ঠানের এতই অভাব যে প্রতিটি ব্লকে গড়ে বছরে অন্তত: পাঁচটি করে নানা নামধারী 'মেলার 'ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সব মেলাই চলে দোকানদারদের থেকে জোর করে আদায় করা টাকা আর নানারকম জুয়া বসানোর টাকা থেকে। এই অর্থের নির্দিষ্ট ভাগ কর্তাব্যক্তিদের হাতেও পৌঁছে যায়। মেলাগুলো থেকে সাধারণ মানুষের অবশ্য একটি লাভ হয়, তা হল শহর থেকে আমদানি হওয়া প্রায় বাতিল যৌনকর্মীদের কাছ থেকে গ্রামের কমবয়সি ছেলেগুলোর

রাতের মেলা- অভিসারের ফসল হিসাবে যৌনরোগ লাভ। আর গ্রামের বারোয়ারি পুজো? অন্য অনেক কিছুর মতো তাও ক্লাব-কালচারের অঙ্গ হয়ে গেছে। পুজোর বাজেট কষতে বসে প্রথমেই পুজোর ক'দিনের আর বিসর্জনের দিনের মদ-মাংসের টাকাটা সরিয়ে রেখে তারপর অন্য খরচাপাতির হিসেব শুরু হয়। অথচ পুতুল নাচ, কবিগান, গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নিজেদের থিয়েটার - মায় যাত্রাও এখন গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গেছে। আছে 'বেদের মেয়ে' ধরনের সিনেমা আর মিস লিলি - মিস পলি রাখা যাত্রাদলগুলির যাত্রা। আর আছে চাপিয়ে দেওয়া এই মেলা কালচার।

বাঙালির ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল; অন্তত: গ্রাম বাংলাকে দেখে যেন তাই মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গে শহর আর কটি - সবই তো গ্রাম। সেজন্য গ্রামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মানে সারা রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পুলিশ, সরকারি দপ্তর, পঞ্চায়েত-সবাইকে যথাযোগ্য 'সাম্মানিক' দিয়ে অধিকাংশ গ্রামে ভবিষ্যতের অতি লাভজনক এক কুটির শিল্প খুব দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে-চোলাই তৈরী শিল্প। দুর্ভাগা, এখনও আদর্শবাদী, শিক্ষিত আর হতাশার গ্লানিতে ডুবে থাকা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু মানুষ ছাড়া বাকি গ্রামবাসীরা প্রায় কেউই রাত্রে আর সাদা চোখে থাকেন না। দালাল- রাজনীতি ব্যবসায়ী শ্রেনীর মানুষেরা 'বিলাতী' আর বাকিরা 'দেশিতে' মগ্ন থাকেন। সুতরাং বাংলার এই কুটিরশিল্পের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। কোথা থেকে এত চিটেগুড়ের উৎপাদন ও প্রত্যন্ত গ্রাম অবধি অবাধ গতিতে তার পৌঁছে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়, তা প্রশাসন কোনো ভাবেই বুঝতে পারে না! চিটেগুড় 'বাখর' বটি দিয়ে সংশ্লেষণ করে প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে টন টন দেশি মদ। এই মদ পলিপ্যাকে প্যাক হয়ে মদ দোকান ছাড়াও পাইস হোটেল, চা দোকান - মায় পান দোকানে হাজির। দেশপ্রেমী বাঙালির এই 'বাংলা'র প্রেমে মজে থাকাতে অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লাভ! প্রশাসন কি কিছু করে না? নিশ্চয়ই করে। দালাল মাধ্যমে আগে থেকে খবর দিয়ে মাঝে মাঝে গ্রামগুলিতে গিয়ে কিছু পুরানো বাতিল হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙে দিয়ে আসেন বৈকি!

গ্রাম বাংলার 'বাংলু' শিল্প ছাড়াও আরও কিছু ব্যাবসা ও শিল্পের ভবিষ্যৎও খুবই উজ্জ্বল। লটারি ব্যাবসা এরকম একটি উদাহরণ। প্রায় প্রতিটি বড়ো শহরে এখন জাল লটারির টিকিট ছাপানো হয়। স্থানীয় প্রেসে গোপনে ছাপানো এইসব টিকিটগুলি খালিচোখে দেখতে একদম আসল টিকিটের মতো। তবে এগুলির উপর যেসব নাম্বার লাগানো থাকে - সেই নাম্বারগুলি সবই কাল্পনিক— সেরকম কোনো নাম্বারে কিন্তু খেলা হয় না। ফলে এইসব টিকিট কিনে কোনোদিন কোন পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশে যে-কোনো লটারির টিকিট যে কেউ বিক্রি করতে পারে- আর লটারি টিকিট বেচা-কেনা করার জন্য কোনো রসিদ দেওয়ার কোন নিয়ম চালু নাই। ফলে মফস্সল শহরগুলিতে ও গ্রামাঞ্চলে ভাগ্য ফেরানোর লোভে গরিব খেটে খাওয়া

মানুষগুলি নিজেদের সামান্য রোজগারের একটা বড়ো অংশ এভাবে ঠগবাজদের হাতে দিয়ে দেয় লটারির কিনতে গিয়ে। এরপর যেমন ধরুন 'ইউনিয়ন' শিল্প। কয়েকজন অলস বদমাশ ছেলে স্থানীয় দাদাকে মাসিক টাকা দেওয়ার চুক্তি করে নিয়ে বাস স্টপেজের কাছে জবরদখল করা জমিতে হঠাৎ হঠাৎ করে এক-একটি সাইন বোর্ড টাঙিয়ে দেন। বিচিত্র ধরনের নাম এইসব ইউনিয়নের, দেখবেন একই মফসস্‌ল শহরে একই রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন দাদার মদতে বিভিন্ন নামের কয়েকটি 'ইউনিয়ন'। এদের একমাত্র কাজ ট্যুরিস্ট বাস-ট্যাক্‌সি -মাল বোঝাই লরি ইত্যাদি থেকে প্রতিদিন জোরকরে চাঁদা আদায় করা। দুই টাকা থেকে দশটাকা গাড়ি প্রতি রেট, সারাদিনে কমপক্ষে এক থেকে তিন হাজার টাকা রোজগার। দাদাদের চুক্তিমতো টাকা দেওয়ার পরও যা থাকে তাতে পঞ্চ 'ম' কারসহ খানা-পিনা ভালোই চলে। এছাড়া ছাপানো 'ছিলিপ' হাতে নিয়ে বাস লরি-ট্যাক্‌সি থামিয়ে বারো মাসের দুশো চল্লিশ পার্বণের চাঁদা আদায় করার জন্য প্রতিটি বাস স্টপেজে , নদী সেতুর মুখে বা বাস রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা বাজারে ঢুলু ঢুলু চোখের ঈশ্বর ভক্তরা সব জড়ো হয়ে রয়েছেন। ভোটের সময় ছাড়া বাকী সময়টা এদের 'কাজে' রাখতে হবে তো! এরপর ধরুন 'ছিডি' শিল্প। রঙীন টিভির দাম কমে গিয়ে আর গ্রামবাংলায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়ে এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার হয়েছে। হুক করা বিদ্যুতে চলা ভিডিও হলগুলি তো আছেই , এছাড়াও ক্লাবঘর - এমনকি চা দোকানেও একটি রঙিন টিভি ভাড়ায় জোগাড় করতে পারলেই হল। শ খানেক টাকা যোগাড় করতে পারলেই পাওয়া যায় সাদা চামড়ার সাহেব - মেমদের নীল ছবি। গোঁফ না বেরোনো কিশোর থেকে তার দাদুর বয়সি প্রৌঢ় - সবাই 'রস' নেওয়ার জন্য অন্ধকারে বসে আছেন উজ্জ্বল রঙিন আলোর উৎসের দিকে তাকিয়ে।

সুতরাং গ্রামবাংলার তথা বাঙালির ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল - এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে কি?

—

বারো] আনন্দবাজার পত্রিকা কলকাতা শুক্রবার ২১ অক্টোবর ২০০৫

সাট্টায় সর্বস্বান্ত স্বামী, স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে সংসার এখন নিষিদ্ধ পাড়ায়

অনিমেষ বসু সরকার ● শান্তিপুর

স্ত্রীর ঘরে 'লোক' এলে ছেলে কোলে নিয়ে বাইরে চলে আসেন প্রশান্ত শীল।

স্ত্রীকে সংসারের বাইরেও এনেছেন তিনিই।

প্রেম করে বিয়ের পরে বছর ঘুরতেই শুরু হয় সংসারে টানাটানি। রঙের মিস্ত্রি প্রশান্তবাবুর সেই সঙ্গে ছিল সাট্টা লটারির শখ। যেটুকু রোজগার হত, সেটাও চলে যেত ওই সাট্টা খেলতেই। শেষ পর্যন্ত যখন আর সংসার চলে না, ঘরনীকে নিয়ে তুললেন শান্তিপুরের যৌনকর্মীদের পল্লিতে। দিন পনেরো হল সেখানেই সংসার পেতেছেন তাঁরা।

প্রশান্তবাবুর স্ত্রী বললেন, "একেবারে রোজগার যে করত না তা নয়। কিন্তু সাট্টার নেশায় সব ভুলে গেল। সংসার, ছেলে, আমি সব ভেসে গেল ওর কাছে। শেষ পর্যন্ত এখানে এলাম। এখন আমিই কোনওমতে সংসার চালাচ্ছি।"

নিজেকে দুষছেন প্রশান্তবাবুও। তিনিই জানালেন, তাঁদের বাড়ি কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার পল্লিশ্রীতে। সেখানে একটি ভাড়া বাড়িতে সংসার পেতেছিলেন দু'জনে। বিয়ে হয়েছিল দু'বছর আগে। তাঁর কথায়, "বিয়ের পর একটা বছর খুব ভাল কেটেছিল। তারপর সাট্টা লটারি খেলতে গিয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি। আকণ্ঠ দেনায় ডুবে গিয়েছি।"

ইতিমধ্যে সন্তানও হয়েছে। কিন্তু সংসারে তখন অশান্তি চরমে। প্রশান্তবাবুর স্ত্রী বলেন, "সংসারের সব শান্তি কেড়ে নিল ওই এক সাট্টা লটারির নেশা। একটা সময় দিনের পর দিন কেবল মুড়ি আর জল খেয়ে কাটাতে হল।" তারপরে দু'জনেই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, যে করে হোক, লক্ষ্মীর মুখ দেখতে হবে। তারপরেই প্রশান্ত তাঁর সংসারের লক্ষ্মীকে নিয়ে এলেন শান্তিপুরের যৌনকর্মীদের পল্লিতে। এখন ওই পল্লির এক চিলতে ঘরে তাঁদের সংসার।

প্রশান্তবাবুর মা কিন্তু এখনও জানেন না তাঁর পুত্র-পুত্রবধূ-নাতি কোথায়। কৃষ্ণনগরে নিজের টালির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য, "ওরা যে কোথায় গিয়েছে জানি না। আমাকে তো কিছু বলে না।"

কিন্তু প্রশান্তবাবুর শ্যালিকা এত সহজেই গোটা ঘটনাটা মেনে নিতে রাজি নন। প্রশান্তবাবুর শ্বশুরবাড়ি কৃষ্ণনগরেই। তাঁর শ্যালিকা অন্ধ। অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীর অভিযোগ, "আমার দিদি পরিস্থিতির শিকার।" কিন্তু তার মা'র সাফ কথা, "আমার বড় মেয়ে যদি ফিরেও আসে, আমি তার মুখ দেখতে চাই না। আমার মেয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

ফিরে আসার কথা অবশ্য ভাবেনও না প্রশান্তবাবুর স্ত্রী। তাঁর কথায়, "ফিরতে চাইলেও সমাজ কী আমাকে মেনে নেবে?" তিনি যখন সাজসজ্জা করে খদ্দের ধরতে দরজার সামনে দাঁড়ান, মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান প্রশান্ত। তিনি এখন আর সাট্টা খেলেন না।

নদিয়ার পুলিশ সুপার আর রাজশেখরণ জানিয়েছেন, "শহরে কী ভাবে জুয়া বন্ধ করা যায়, তা দেখছি।"